



ঐযুক্ত চিত্তামণি ঘোষ কর্তৃক
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত
২২নং কণ্ঠসামিলা স্ট্রিট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জাপান-যাত্রী

১

বম্বাই থেকে বক্তবার যাত্রা করেচি জাহাজ চলতে দেবি করে নি। কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়। এটা ভাল লাগে না। কেননা যাত্রা করার মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চয় করা। মন যখন চলবার মুখে, তখন তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখা তার এক শক্তির সঙ্গে তার আর-এক শক্তির লড়াই বাধানো। মানুষ যখন ঘরের মধ্যে জমিয়ে বসে আছে, তখন বিদায়ের আয়োজনটা এই জন্তেই কর্তকর; কেন না, থাকার সঙ্গে যাওয়ার সন্ধিস্থলটা মনের পক্ষে মুক্তিলের জায়গা,—সেখানে তাকে দুই উল্টো দিক সামলাতে হয়,—সে একরকমের কঠিন ব্যায়াম।

বাড়ির লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু জাহাজ চলল না। অর্থাৎ যারা থাকবার তারাই গেল, আর যেটা চলবার সেটাই স্থির হয়ে রইল,—বাড়ি গেল সবে, আর তরী রইল দাঁড়িয়ে।

বিদায় মাত্রেরই একটা ব্যথা আছে,—সে ব্যথাটার প্রধান কারণ এই, জীবনে যা কিছুকে সব চেয়ে নির্দিষ্ট করে' পাওয়া গেছে, তাকে অনির্দিষ্টের আড়ালে সমর্পণ করে' যাওয়া। তার বদলে হাতে হাতে আর একটা কিছুকে পাওয়া না গেলে এই শূন্যতাই মনের মধ্যে বোকা হয়ে দাঁড়ায়। সেই পাওনাটা হচ্ছে অনির্দিষ্টকে ক্রমে ক্রমে নির্দিষ্টের ভাণ্ডারের মধ্যে পেয়ে চলতে থাকা। অপরিচয়কে ক্রমে ক্রমে পরিচয়ের কোঠার মধ্যে ভুক্ত করে নিতে থাকা। সেই জন্মে মাত্রার মধ্যে যে দুঃখ আছে, চলাটাই হচ্ছে তার ওষুধ। কিন্তু যাত্রা করলুম অঞ্চল চললুম না—এটা সহ করা শক্ত।

অচল জাহাজের ক্যাবিন হচ্ছে বন্ধনদশার দ্বিগুণ-চোলাই-করা কড়া আরক। জাহাজ চলে বলেই তার কামরার সঙ্কীর্ণতাকে আমরা ক্ষমা করি। কিন্তু জাহাজ যখন স্থির থাকে তখন ক্যাবিনে স্থির থাকা, মৃত্যুর ঢাকনাটার নীচে বার গোরের ঢাকনার মত।

ডেকের উপরেই শোবার ব্যবস্থা করা গেল। ইতিপূর্বে অনেকবার জাহাজে চড়েছি, অনেক কাপ্তেনের সঙ্গে ব্যবহার করেছি। আমাদের এই জাপানি কাপ্তেনের একটু বিশেষত্ব আছে। মেলামেশায় ভালমানুষিতে হঠাৎ মনে হয় ঘোরো লোকের মত। মনে হয় এঁকে অনুরোধ করে' যা-খুসি-তাই করা যেতে পারে,—কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় নিয়মের লেশমাত্র নড়চড় হবার জো নাই। আমাদের সহযাত্রী ইংরেজ

বন্ধু ডেকের উপরে তাঁর ক্যাবিনের গদি আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের বাড় নড়ল, সে যতে উঠল না। সকালে ব্রেকফাস্টের সময় তিনি যে টেবিলে বসেছিলেন, সেখানে পাখা ছিল না; আমাদের টেবিলে জায়গা ছিল, সেই দেখে তিনি আমাদের টেবিলে বসবার ইচ্ছা জানালেন। অনুরোধটা সামান্য, কিন্তু কাণ্ডেন করেন, এবেলাকার মত বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, ডিনারের সময় দেখা যাবে। আমাদের টেবিলে চৌকি খালি রইল, কিন্তু তবু নিয়মের ব্যত্যয় হল না। বেশ বোঝা যাচ্ছে, অতি অল্পমাত্রাও টিলেঢালা কিছু হাতে পারবে না।

রাত্রে বাইরে শোয়া গেল, কিন্তু এ কেমনতরো বাইরে? জাহাজের মাস্তুলে মাস্তুলে আকাশটা যেন ভীষ্মের মত শরশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। কোথাও শূন্যরাজ্যের ফাঁকা নেই। অথচ বস্তুরাজ্যের স্পর্শতাও নেই। জাহাজের আলোগুলো মস্ত একটা আয়তনের সূচনা করেছে, কিন্তু কোনো আকারকে দেখতে দিচ্ছে না।

কোনো একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলুম যে, আমি নিশীথরাত্রির সভাকবি। আমার বরাবর একথাই মনে হয় যে দিনের বেলাটা মর্ত্যালোকের, আর রাত্রিবেলাটা স্বরলোকের। মানুষ ভয় পায়, মানুষ কাজকর্ম করে, মানুষ তার পায়ের কাছে পথটা স্পর্শ করে' দেখতে চায়, এই জগতে এত বড় একটা আলো ছালাতে হয়েছে। দেবতার ভয় নেই, দেবতার কাজ

নিঃশব্দে গোপনে, দেবতার চলার সঙ্গে স্তব্ধতার কোনো বিরোধ নেই, এই জন্মেই অসীম অন্ধকার দেবসভার আস্তরণ। দেবতা রাত্রেই আমাদের বাতায়নে এসে দেখা দেন।

কিন্তু মানুষের কারখানা যখন আলো জ্বালিয়ে সেই রাত্রিকেও অধিকার করতে চায়, তখন কেবল যে মানুষই ক্লিষ্ট হয় তা নয়,—দেবতাকেও ক্লিষ্ট করে তোলে। আমরা যখন থেকে বাতি ছেলে রাত জেগে এগুজামিন পাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, তখন থেকে সূর্যের আলোর সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট নিজের সীমানা লঙ্ঘন করতে লেগেছি, তখন থেকেই সুর-মানবের যুদ্ধ বেধেছে। মানুষের কারখানা-ঘরের চিমনিগুলো ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিজের অস্তরের কালীকে দু্যলোকে বিস্তার করছে, সে অপরাধ তেমন গুরুতর নয়,—কেন না দিনটা মানুষের নিজের, তার মুখে সে কালী মাথালেও দেবতা তা নিয়ে নালিশ করবেন না। কিন্তু রাত্রির অথগু অন্ধকারকে মানুষ যখন নিজের আলো দিচ্ছে ফুটো করে দেয়, তখন দেবতার অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করে। সে যেন নিজের দখল অতিক্রম করে আলোকের খুঁটি গেড়ে দেবলোকে আপন সীমানা চিহ্নিত করতে চায়।

সেদিন রাত্রে গঙ্গার উপরে সেই দেববিদ্রোহের বিপুল আয়োজন দেখতে পেলুম। তাই মানুষের ক্রান্তির উপর সুরলোকের শাস্তির আশীর্ব্বাদ দেখা গেল না। মানুষ বলতে চাচ্ছে আমিও দেবতার মত, আমার ক্রান্তি নেই। কিন্তু সেটা মিথ্যা কথা—এইজন্মে সে চারিদিকের শাস্তি নষ্ট করছে। এইজন্মে

অন্ধকারকেও সে অশুচি করে তুলেচে।

- দিন আলোকের দ্বারা আবিষ্ট, অন্ধকারই পরম নির্মূল। অন্ধকার রাত্রি সমুদ্রের মত,—তা অঞ্জনের মত কালো, কিন্তু তবু নিরঞ্জন। আর দিন নদীর মত,—তা কালো নয়, কিন্তু পঙ্কিল। রাত্রির সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারকেও সেদিন সেই খিদিরপুরের জেটির উপর মলিন দেখলুম। মনে হল, দেবতা স্বয়ং মুখ মলিন করে' রয়েছেন।

এমনি খারাপ লেগেছিল এডেনের বন্দরে। সেখানে মানুষের হাতে বন্দী হয়ে সমুদ্রও কলুষিত। জলের উপরে তেল ভাস্চে, মানুষের আবর্জ্ঞনাকে স্বয়ং সমুদ্রও বিলুপ্ত করতে পারচে না। সেই রাতে জাহাজের ডেকের উপর শুয়ে অসীম রাত্ৰিকেও যখন কলঙ্কিত দেখলুম তখন মনে হল একদিন ইন্দ্রলোক দানবের আক্রমণে পীড়িত হয়ে ব্রহ্মার কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন—আজ্ঞা মানবের অত্যাচার থেকে দেবতাদের কোন্ রুদ্র রক্ষা করবেন ?

২

জাহাজ ছেড়ে দিলে। মধুর বহিছে বায়ু ভেসে চলি রঙ্গে।
কিন্তু এর রঙ্গটা কেবলমাত্র ভেসে চলার মধ্যেই নয়। ভেসে চলার একটি বিশেষ দৃষ্টি ও সেই বিশেষ দৃষ্টির বিশেষ রস আছে। যখন হেঁটে চলি তখন কোনো অখণ্ড ছবি চোখে পড়ে না। ভেসে চলার মধ্যে দুই বিরোধের পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়েছে—

বসেও আছি, চল্চিও। সেই জন্মে চলার কাজ হচ্ছে, অথচ চলার কাজে মনকে লাগাতে হচ্ছে না। তাই মন, যা মামনে দেখতে তাকে পূর্ণ করে' দেখতে। জল স্থল আকাশের সমস্তকে এক করে মিলিয়ে দেখতে পাচ্ছে।

ভেসে চলার মধ্যে দিয়ে দেখার আর একটা গুণ হচ্ছে এই যে, তা মনোযোগকে জাগ্রত করে, কিন্তু মনোযোগকে বন্ধ করে না। না দেখতে পেলোও চলত, কোনো অসুবিধে হত না, পথ ভুলতুম না, গর্তয় পড়তুম না। এই জন্মে ভেসে চলার দেখাটা হচ্ছে নিতান্তই দায়িত্ববিহীন দেখা,—দেখাটাই তার চরম লক্ষ্য— এই জন্মেই এই দেখাটা এমন বৃহৎ, এমন আনন্দময়।

এতদিনে এইটুকু বোঝা গেছে যে, মানুষ নিজের দাসত্ব করতে বাধ্য, কিন্তু নিজের সম্বন্ধেও দায়ে-পড়া কাজে তার শ্রীতি নেই। যখন চলাটাকেই লক্ষ্য করে পায়চারি করি, তখন সেটা বেশ; কিন্তু যখন কোথাও পৌঁছবার দিকে লক্ষ্য করে চলতে হয়, তখন সেই চলার বাধ্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার শক্তিতেই মানুষের সম্পদ প্রকাশ পায়। ধন জিনিষটার মানেই এই—তাতে মানুষের প্রয়োজন কমায় না কিন্তু নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে তার নিজের বাধ্যতা কমিয়ে দেয়। যাওয়া পরা, দেওয়া নেওয়ার দরকার তাকে মেটাতেই হয়, কিন্তু তার বাইরে যেখানে তার উদ্ভূত সেইখানেই মানুষ মুক্ত, সেইখানেই সে বিস্তৃত নিজের পরিচয় পায়। এই জন্মেই ঘটিবাটি প্রভৃতি দরকারী জিনিষকেও মানুষ সুন্দর করে' গড়ে' তুলতে চায়—

কারণ, ঘটিবাটির উপযোগিতা মানুষের প্রয়োজনের পরিচয় মাত্র কিন্তু তার সৌন্দর্য্যে মানুষের নিজেরই রুচির নিজেরই আনন্দের পরিচয়। ঘটিবাটির উপযোগিতা বল্চে মানুষের দায় আছে, ঘটিবাটির সৌন্দর্য্য বল্চে মানুষের আত্মা আছে।

আমার না হলেও চল্ত, কেবল আমি ইচ্ছা করে' কর্চি এই যে মুক্ত কর্ছের ও মুক্ত ভোক্ত্বের অভিমান, যে অভিমান বিশ্বদ্রষ্টার এবং বিশ্বরাজেশ্বরের,—সেই অভিমানই মানুষের সাহিত্যে এবং আর্টে। এই রাজ্যটি মুক্ত মানুষের রাজ্য, এখানে জীবনযাত্রার দায়িত্ব নেই।

আজ সকালে যে প্রকৃতি সবুজ পাড়-দেওয়া গেরুয়া নদীর সাড়ি পরে' আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, আমি তাকে দেখ্চি। এখানে আমি বিশুদ্ধ দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা আমিটী যদি নিজেকে ভাষায় বা রেখায় প্রকাশ করত, তাহলে সেইটেই হত সাহিত্য, সেইটেই হত আর্ট। খামকা বিরক্ত হয়ে এমন কথা কেউ বলিতে পারে "তুমি দেখ্চ তাতে আমার গরজ কি? তাতে আমার পেটও ভরবে না, আমার ম্যালেরিয়াও যুচবে না, তাতে আমার ফসল-ক্ষেতে বেশি করে ফসল ধরবার উপায় হবে না।" ঠিক কথা। আমি যে দেখ্চি এতে তোমার কোন গরজ নেই। অথচ আমি যে শুদ্ধমাত্র দ্রষ্টা, এ সম্বন্ধে বস্তুতই যদি তুমি উদাসীন হও—তাহলে জগতে আর্ট এবং সাহিত্য সৃষ্টির কোনো মানে থাকে না।

আমাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার, আজ এতক্ষণ ধরে'

তুমি যে লেখাটা লিখচ, ওটাকে কি বলবে? সাহিত্য, না
তত্ত্বালোচনা।

নাই বলুম তত্ত্বালোচনা। তত্ত্বালোচনার যে ব্যক্তি আলোচনা
করে, সে প্রধান নয়, তত্ত্বটাই প্রধান। সাহিত্যে সেই ব্যক্তিটাই
প্রধান, তত্ত্বটা উপলক্ষ্য। এই যে শাদা মেঘের ছিটে-দেওয়া
নীল আকাশের নীচে শ্যামল-ঐশ্বর্যময়ী ধরণীর আঙিনার সামনে
দিয়ে সন্ধ্যাসী জলের স্রোত উদাসী হয়ে চলেচে, তার মাঝখানে
প্রধানত প্রকাশ পাচ্ছে দ্রুতা আমি। যদি ভূতত্ত্ব বা ভূবৃত্তান্ত
প্রকাশ করতে হত, তাহলে এই আমিকে সরে' দাঁড়াতে হত।
কিন্তু এক-আমির পক্ষে আর-এক আমির অহেতুক প্রয়োজন
আছে, এই জন্ম সময় পেলেই আমরা ভূতত্ত্বকে সরিয়ে রেখে
সেই আমির সন্ধান করি।

তেমনি করেই কেবলমাত্র দৃশ্যের মধ্যে নয়, ভাবের মধ্যে
যে ভেসে চলেচে, সেও সেই দ্রুতা-আমি। সেখানে, যা বল্চে
সেটা উপলক্ষ্য, যে বল্চে সেই লক্ষ্য। বাহিরের বিশ্বের
রূপধারার দিকেও আমি যেমন তাকাতে তাকাতে চলেছি, আমার
অন্তরের চিন্তাধারা ভাবধারার দিকেও আমি তেমনি চিন্তাদৃষ্টি দিয়ে
তাকাতে তাকাতে চলেছি। এই ধারা কোনো বিশেষ কর্মের
বিশেষ প্রয়োজনের সূত্রে বিধৃত নয়। এই ধারা প্রধানত
লজিকের দ্বারাও গাঁথা নয়, এর গ্রন্থনসূত্র মুখ্যত আমি। সেইজন্মে
আমি কেবলমাত্র করিনে সাহিত্য সম্বন্ধে বক্ষ্যমান রচনাটিকে
লোক পাকা কথা বলে গ্রহণ করিবে কি না। বিশ্বলোকে এর

চিন্তালোকে “আমি দেখছি” এই অনাবশ্যক আনন্দের কথাটা বলাই হচ্ছে আমার কাজ। এই কথাটা যদি ঠিক করে বলতে পারি তাহলে অন্য সকল আমার দলও বিনা প্রয়োজনে খুসি হয়ে উঠবে।

উপনিষদে লিখচে, এক-ডালে দুই পাখী আছে, তার মধ্যে এক পাখী খায়, আর এক পাখী দেখে। যে পাখী দেখে তারি আনন্দ বড় আনন্দ; কেন না, তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখী আছে। এক পাখীর প্রয়োজন আছে, আর-এক পাখীর প্রয়োজন নেই। এক পাখী ভোগ করে আর-এক পাখী দেখে। যে-পাখী ভোগ করে সে নির্মাণ করে, যে পাখী দেখে সে সৃষ্টি করে। নির্মাণ করা মানে মাপে তৈরি করা; অর্থাৎ যেটা তৈরি করা হচ্ছে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য কিছুর মাপে তৈরি করা,—নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর সৃষ্টি করা অন্য কোনো-কিছুর মাপের অপেক্ষা করে না, সে হচ্ছে নিজেকে সজ্জন করা, নিজেকেই প্রকাশ করা। এই ক্ষেত্রে ভোগী পাখী যে সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ করচে তা প্রধানত বাইরের উপকরণ, আর দ্রুত পাখীর উপকরণ হচ্ছে আমি পদার্থ। এই আমার প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্তব্যের দায়ও না।

পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় রহস্য, দেখবার কিছুটি নয়, যে দেখে সেই মানুষটি। এই রহস্য আপনি আপনার ইয়ত্তা পাচ্ছে

না,—হাজার হাজার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখতে চেষ্টা করচে। যা-কিছু ঘটচে এবং যা-কিছু ঘটতে পারে, সমস্তর ভিতর দিয়ে নিজেকে বাজিয়ে দেখচে।

এই যে আমার এক-আমি, এ বছর মধ্যে দিয়ে চলে' চলে' নিজেকে নিত্য উপলব্ধি করতে থাকে। বছর সঙ্গে মানুষের সেই একের মিলনজাত রসের উপলব্ধিই হচ্ছে সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু নয়, দ্রষ্টা আমিই তার লক্ষ্য।

তোমা মারু জাহাজ
২০শে বৈশাখ, ১৩২৩।

• ৩

বৃহস্পতিবার বিকেলে সমুদ্রের মোহানায় পাইলট নেবে গেল। এর কিছু আগে থাকতেই সমুদ্রের রূপ দেখা দিয়েচে। তার কূলের বেড়ি খসে' গেচে। কিন্তু এখনও তার মাটির রং ঘোচে নি। পৃথিবীর চেয়ে আকাশের সঙ্গেই যে তার আত্মীয়তা বেশি, সে কথা এখনো প্রকাশ হয় নি,—কেবল দেখা গেল জলে আকাশে এক-দিগন্তের মালা বদল করেছে। যে ঢেউ দিয়েচে, নদীর ঢেউয়ের ছন্দের মত তার ছোট ছোট পদ বিভাগ নয়; এ যেন মন্দাক্রান্তা—কিন্তু এখনো সমুদ্রের শাদ্দুল বিক্রীড়িত শুরু হয় নি।

আমাদের জাহাজের নীচের তলার ডেকে অনেকগুলি ডেক প্যাসেঞ্জার; তাদের অধিকাংশ মাদ্রাজি, এবং তারা প্রায়

সকলেই যেসুনে যাচ্ছে। তাদের পরে এই জাহাজের লোকের ব্যবহারে কিছুমাত্র কঠোরতা নেই, তারা বেশ স্বচ্ছন্দে আছে। জাহাজের ভাঙার থেকে তারা প্রত্যেকে একখানি করে ছবি অঁকা কাগজের পাখা পেয়ে ভারি খুসি হয়েছে।

এরা অনেকেই হিন্দু, সুতরাং এদের পথের কষ্ট ঘোচান কারো সাধ্য নয়। কোন মতে আখ চিবিয়ে, চিঁড়ে খেয়ে এদের দিন যাচ্ছে। একটা জিনিষ ভারি চোখে লাগে, সে হচ্ছে এই যে, এরা মোটের উপর পরিষ্কার—কিন্তু সেটা কেবল বিধানের গণ্ডির মধ্যে,—বিধানের বাইরে এদের নোংরা হবার কোনো বাধা নেই। আখ চিবিয়ে তার ছিব্ড়ে অতি সহজেই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু সেটুকু কষ্ট নেওয়া এদের বিধানে নেই,—যেখানে বসে থাকে তার নেহাৎ কাছে ছিব্ড়ে ফেলতে ; —এমনি করে চারিদিকে কত আবর্জনা যে জমে উঠে তাতে এদের ক্রক্ষেপ নেই। সব চেয়ে আমাকে পীড়া দেয় যখন দেখি ধুধু ফেলা সম্বন্ধে এরা বিচার করে না। অথচ বিধান অনুসারে শুচিতা রক্ষা করবার বেলায় নিতান্ত সামান্য বিষয়েও এরা অসামান্য রকম কষ্ট স্বীকার করে। আচারকে শক্ত করে ভুলে বিচারকে ঢিলে করতেই হয়। বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধলে মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধবার শক্তি হারায়।

এদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান আছে ; পরিষ্কার হওয়া সম্বন্ধে তারা যে বিশেষ সতর্ক তা নয়, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাদের ভারি সতর্কতা। ভাল কাপড়টি পরে টুপিটি বাগিয়ে

তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকতে চায়। একটু মাত্র পরিচয় হলেই অথবা না হলেও তারা দেখা হলেই প্রসন্ন মুখে সেলাম করে। বোঝা যায় তারা বাহিরের সংসারটাকে মানে। কেবলমাত্র নিজের জাতির গণ্ডির মধ্যে যারা থাকে, তাদের কাছে সেই গণ্ডির বাহিরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে। তাদের সমস্ত বাঁধাবাধি জাত-রক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতিতে বাঁধা নয় বলে বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাধি আছে। এই জন্মে আদব কায়দা মুসলমানের। আদব কায়দা হচ্ছে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম। মনুতে পাওয়া যায় মা মাসী মামা পিসের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতদূর,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কিরকম হবে;—কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কিরকম হওয়া উচিত, তার বিধান নেই। এই জন্মে সম্পর্ক-বিচার ও জাতি-বিচারের বাহিরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্মে, পশ্চিম ভারত, মুসলমানের কাছ থেকে সেলাম শিক্ষা করেছে। কেননা, প্রণাম নমস্কারের সমস্ত বিধি কেবল জাতির মধ্যেই খাটে। বাহিরের সংসারটাকে ইতিপূর্বে আমরা অস্বীকার করে' চলেছিলুম বলেই সাজসজ্জা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা, হয় আমরা মুসলমানের কাছ থেকে নিরেচি, নয় ইংরাজের কাছ থেকে নিচ্ছি। ওটাতে আমাদের আরাম নেই। সেই জন্মে ভদ্রতার সাজ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আমাদের পাকাপাকি কিছুই ঠিক হল না।

বাঙালী উদ্ভাসভার সাজসজ্জার যে এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য, তার কারণই এই। সব সাজই আমাদের সাজ। আমাদের নিজের সাজ, মণ্ডলীর তিতরকার সাজ,—সুতরাং বাইরের সংসারের হিসাবে সেটা বিবসন বলেই হয়,—অস্ত্রপূরের মেয়েদের বসনটা যেরকম, অর্থাৎ দিগ্বসনের সুন্দর অনুকরণ। বাইরের লোকের সঙ্গে আমরা ভাই খুঁড়ে দিদি মাসী প্রভৃতি কোন-একটা সম্পর্ক পাতাবার জন্যে ব্যস্ত থাকি,—নইলে আমরা খই পাইনে। 'হয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা, নয় অত্যন্ত দূরত্ব,—এর মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড জায়গা আছে, সেটা আজো আমাদের ভাল করে' আয়ত্ত হয় নি। এমন কি, সেখানকার বিধিবদ্ধনকে আমরা হুচুতার অভাব বলে নিন্দা করি। এ কথা ভুলে যাই, যে-সব মানুষকে হৃদয় দিতে পারিনে, তাদেরও কিছু দেবার আছে। এই দানটাকে আমরা কৃত্রিম বলে' গাল দিই, কিন্তু জাতের কৃত্রিম খাঁচার মধ্যে মানুষ বলেই এই সাধারণ আদব-কায়দাকে আমাদের কৃত্রিম বলে' ঠেকে। বস্ত্রভরনের মানুষকে আঙ্গুর বলে', এবং তার বাইরের মানুষকে আগন সমাজের বলে', এবং তারো বাইরের মানুষকে মানব সমাজের বলে' স্বীকার করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। হৃদয়ের বন্ধন, শিষ্টাচারের বন্ধন, এনং আদবকায়দার বন্ধন,—এই তিনই মানুষের প্রকৃতিগত।

কাণ্ডেন বলে' রেখেচেন, আজ সন্ধ্যাবেলায় বড় হবে, ব্যারোমিটার নাওচে। কিন্তু শান্ত আকাশে সূর্য অস্ত গেল।

বাতাসে কেশরিনাথ বেগ থাকলে তাকে মন্দ পবন বলে, অর্থাৎ
 কুব্জীর মন্দ গমনের সঙ্গে কবিরা তুলনা করতে পারে,—এ
 তার চেয়ে বেশি; কিন্তু চেউগুলোকে নিয়ে রক্তভালের
 করতাল বাজাবার মত আসর জমেনি,—যেটুকু খোলার বোল
 দিচ্ছে তাতে ঝড়ের গৌরচন্দ্রিকা বলেও মনে হয়নি। মনে
 করলুম মানুষের কুষ্ঠির মত, বাতাসের কুষ্ঠি গণনার সঙ্গে ঠিক
 মেলে না,—এ যাত্রা ঝড়ের ফাঁড়া কেটে গেল। তাই পাই-
 লটের হাতে আমাদের ডাঙার চিঠিপত্র সমর্পণ করে' দিয়ে প্রসন্ন
 যমুদ্রকে অভ্যর্থনা করবার জন্তে ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে
 পশ্চিমমুখে হয়ে বসলুম।

হোলির রাতে হিন্দুস্থানী দরওয়ানদের খচমচির মত বাতা-
 সের লয়টা ক্রমেই দ্রুত হয়ে উঠল। জলের উপর সূর্যাস্তের
 আলপনা-জাঁকা আসনটি আচ্ছন্ন করে' নীলাশ্বরীর ঘোমটা-পরা
 সন্ধ্যা এসে বসল। আকাশে তখনও মেঘ নেই, আকাশ-
 সমুদ্রের কেনার মতই ছায়াপথ জল্জল্ করতে লাগল।

ডেকের উপর বিছানা করে' যখন শুলুম, তখন বাতাসে এক
 জলে বেশ একটা কবির লড়াই চলছে,—একদিকে মৌ শব্দে
 শব্দে তান লাগিয়েচে, আর একদিকে ছল্ ছল্ শব্দে জখার
 দিচ্ছে, কিন্তু ঝড়ের পাল্লা বলে' মনে হলনা। আকাশের
 তারাদের সঙ্গে চোখোচোখি করে' কখন এক সময় চোখ বুজে
 এল।

রাতে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোন একটি

বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে নেইটে কাকে বুঝিয়ে বলছি। আশ্চর্য্য তার রচনা, যেন একটা বিপুল আর্ন্তরালের মত, অমত তার মধ্যে মরণের একটা বিরাট বৈরাগ্য আছে। এই মন্ত্রের মাঝখানে জেগে উঠে দেখি আকাশ এবং জল তখন উদ্ভাস্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র চামুণ্ডার মত ফেনার জিহ্বা মেলে প্রচণ্ড অটুহাস্তে নৃত্য করছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘগুলো মরিয়া হয়ে উঠেছে, যেন তাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই,—বল্চে, যা' থাকে কপালে। আর জলে যে বিষম গর্জ্জন উঠে, তাতে মনের ভাবনাও যেন শোনা যায় না, এমনি বোধ হতে লাগল। মালারা ছোট ছোট লণ্ঠন হাতে ব্যস্ত হয়ে এদিকে ওদিকে চলাচল করছে,—কিন্তু নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের প্রতি কর্ণধারের সঙ্কেত ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এবার বিছানায় শুয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু বাইরে জলবাতালের গর্জ্জন, আর আমার মনের মধ্যে সেই স্বপ্নলব্ধ মরণমন্ত্র ক্রমাগত বাজতে লাগল। আমার ঘুমের সঙ্গে জাগরণ ঠিক যেন ঐ ঝড় এবং চেউয়ের মতই এলোমেলো মাতামাতি করতে থাকল,—ঘুমচ্ছি কি জেগে আছি বুঝতে পারছি নে।

রাগী মানুষ কথা কইতে না পারলে যেমন কুলে কুলে ওঠে, সকাল-বেলাকার মেঘগুলোকে তেমনি বোধ হল। বাতাস কেবলই শব্দ, এবং জল কেবলি বাকি অস্ত্যস্থ বর্ণ য র ল ব হ নিয়ে চণ্ডীশাঠ বাধিয়ে দিলে, আর মেঘগুলো জটা তুলিয়ে

ক্রকুটি করে বেড়াতে লাগল। অবশেষে মেঘের বাণী জল-
ধারায় নেবে পড়ল। নারদের বীণাধ্বনিতে বিষ্ণু গঙ্গা-ধারায়
বিগলিত হয়েছিলেন একবার, আমার সেই পৌরাণিক কথা মনে
এসেছিল। কিন্তু এ কোন্ নারদ প্রলয়-বীণা বাজাচ্ছে? এর
সঙ্গে নন্দী ভূঙ্গীর যে মিল দেখি, আর ওদিকে বিষ্ণুর সঙ্গে
রুদ্রের প্রভেদ ঘুচে গেছে।

এপর্যন্ত জাহাজের নিত্যক্রিয়া এক রকম চলে যাচ্ছে, এমন
কি আমাদের প্রাতরাশেরও ব্যাঘাত হল না। কাণ্ডোনের মুখে
কোনো উদ্বেগ নেই। তিনি বলেন এই সময়টাতে এমন একটু
আধটু হয়ে থাকে;—আমরা যেমন যৌবনের চাকল্য দেখে
বলে থাকি, ওটা বয়সের ধর্ম।

ক্যাবিনের মধ্যে থাকলে রুমঝুমির ভিতরকার কড়াইগুলোর
মত নাড়া খেতে হবে তার চেয়ে খোলাখুলি ঝড়ের সঙ্গে
মোকাবিলা করাই ভাল। আমরা শাল কন্দল মুড়ি দিয়ে
জাহাজের ডেকের উপর গিয়েই বসলুম। ঝড়ের ঝাপট পশ্চিম
দিক থেকে আসচে, সেইজন্যে পূর্বদিকের ডেকে বসা দুঃসাধ্য
ছিল না।

ঝড় ক্রমেই বেড়ে চলল। মেঘের সঙ্গে ঢেউয়ের সঙ্গে
কোনো ভেদ রইল না। সমুদ্রের সে নীল রং নেই,—চারিদিক
ঝাপসা, বিবর্ণ। ছেলেবেলায় আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম,
জলের জালে যে যড়া উঠেছিল তার চাকনা খুলতেই তার
ভিতর থেকে ঝোয়ার মত পাকিয়ে পাকিয়ে প্রকাণ্ড সৈত্য

বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে হল, সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেচে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মত লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে আকাশে উঠে পড়চে।

জাপানী মল্লারা ছুটোছুটি করচে কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, সমুদ্র যেন অটুহাস্তে জাহাজটাকে ঠাট্টা করচে মাত্র;—পশ্চিম দিকের ডেকের দরজা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ, তবু সে সব বাধা ভেদ করে' এক একবার জলের ঢেউ হুড়মুড় করে এসে পড়চে, আর তাই দেখে ওরা হো হো করে উঠচে। কাপ্তেন আমাদের বারবার বলেন,—ছোট ঝড় সামান্য ঝড়। এক সময় আমাদের স্টুয়ার্ড এসে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে এঁকে ঝড়ের খাতিরে জাহাজের কিরকম পথ বদল হয়েছে, সেইটে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। ইতিমধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা লেগে শাল কন্ডল সমস্ত ভিজ়ে শীতে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েচে। আর কোথাও সুবিধা না দেখে কাপ্তেনের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। কাপ্তেনের যে কোনো উৎকণ্ঠা আছে, বাইরে থেকে তার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলুম না।

ঘরে আর বসে থাকতে পারলুম না। ভিজ়ে শাল মুড়ি দিয়ে আবার বাইরে এসে বসলুম। এত তুফানেও যে আমাদের ডেকের উপর আছড়ে আছড়ে ফেলচে না, তার কারণ জাহাজ আকণ্ঠ বোঝাই। ভিতরে যার পদার্থ নেই তার মত দোলায়িত অবস্থা আমাদের জাহাজের নয়। মৃত্যুর কথা

অনেকবার মনে হল। চারিদিকেই ত মৃত্যু, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত মৃত্যু—আবার প্রাণ এর মধ্যে এতটুকু। এই অতি ছোট্টো উপরেই কি সমস্ত আস্থা রাখব, আর এই এত বড়টাকে কিছু বিশ্বাস করব না?—বড়র উপরে ভরসা রাখাই ভাল।

ডেকে বসে থাকা আর চলচে না। নীচে নামতে গিয়ে দেখি সিঁড়ি পর্যন্ত জুড়ে সমস্ত রাস্তা ঠেসে ভর্তি করে ডেক-প্যাসেঞ্জার বসে। বহু কষ্টে তাদের ভিতর দিয়ে পথ করে ক্যাবিনের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। এইবার সমস্ত শরীর মন ঘুলিয়ে উঠল। মনে হল দেহের সঙ্গে প্রাণের আর বন্ডি হচ্ছে না; দুখ মথন করলে মাখনটা যে রকম ছিন্ন হয়ে আসে প্রাণটা যেন তেমনি হয়ে এসেছে। জাহাজের উপরকার দোলা সহ করা যায়, জাহাজের ভিতরকার দোলা সহ করা শক্ত। ক্যাবিনের উপর দিয়ে চলা, আর জুতার ভিতরে কাঁকর নিয়ে চলার যে তফাৎ, এ যেন তেমনি। একটাতে মার আছে কখন নেই, আর একটাতে বেঁধে মার।

ক্যাবিনে শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলুম ডেকের উপর কি স্নেন হুড়মুড় করে ভেঙে ভেঙে পড়চে। ক্যাবিনের মধ্যে হাওয়া আসবার জন্যে যে ফানেলগুলো ডেকের উপর হাঁ করে নিশান নেয়, ঢাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে,—কিন্তু ডেউয়ের প্রবল চোটে তার ভিতর দিয়েও বলকে বলকে ক্যাবিনের মধ্যে জল এসে পড়চে। বাইরে উনপকাশ বায়ুর

নৃত্য, অথচ ক্যাবিনের মধ্যে গুমট। একটা ইলেকট্রিক পান চলচে তাতে তাপটা যেন গায়ের উপর ঘুরে ঘুরে সোজের কাপটা দিতে লাগল।

ইচ্ছা মনে হয় এ একেবারে অসহ্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে শরীর মন প্রাণের চেয়েও বড় একটা সত্তা আছে। কড়ের আকাশের উপরেও যেমন শান্ত আকাশ, তুফানের সমুদ্রের নীচে যেমন শান্ত সমুদ্র—সেই আকাশ সেই সমুদ্রই যেমন বড়, মানুষের অন্তরের গভীরে এবং সমুদ্রে সেইরকম একটি বিরাট শান্ত পুরুষ আছে—বিপদ এবং দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলে তাকে পাওয়া যায়—দুঃখ তার পায়ের তলায়, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না।

সন্ধ্যার সময় বড় খেমে গেল। উপরে গিয়ে দেখি জাহাজটা সমুদ্রের কাছে এতক্ষণ ধরে যে চড়চাপড় খেয়েছে, তার অনেক চিহ্ন আছে। কাপ্তেনের ঘরের একটা প্রাচীর ভেঙে গিয়ে তাঁর আসবাবপত্র সমস্ত ভিজে গেছে। একটা বাঁধা লাইফ-বোট অক্ষয় হয়েছে। ডেকে প্যাসেঞ্জারদের একটা ঘর এবং ভাণ্ডারের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। জাপানী যাত্রীরা এমন সকল কাজে প্ররুষ্ট ছিল যাতে প্রাণ সংশয় ছিল। জাহাজ যে বরাবর আসন্ন সফটের সঙ্গে লড়াই করেছে, তার একটা স্পর্শ প্রমাণ পাওয়া গেল—জাহাজের ডেকের উপর কর্কের তৈরি সাঁতার দেখার জামাগুলো সাজানো। এক সময়ে এগুলো বের করার কথা কাপ্তেনের মনে এসেছিল।—কিন্তু

ঝড়ের পালার মধ্যে সব চেয়ে স্পর্শ করে' আমার মনে পড়চে
জাপানী মাল্লাদের হাসি।

শনিবার দিনে আকাশ প্রসন্ন কিন্তু সমুদ্রের তান্ধেপ এখনো
ঘোচে নি। আশ্চর্য্য এই, ঝড়ের সময় জাহাজ এমন দোলে নি,
ঝড়ের পর যেমন তার দোলা। কালক্ষেকার উৎপাতকে
কিছুতেই যেন সে কমা করতে পারচে না, ক্রমাগতই ফুঁপিয়ে
ফুঁপিয়ে উঠচে। শরীরের অবস্থাটাও অনেকটা সেই রকম,—
ঝড়ের সময় সে একরকম শক্ত ছিল, কিন্তু পরের দিন ভুলতে
পারচে না তার উপর দিয়ে ঝড় গিয়েচে।

আজ রবিবার। জলের রং ফিকে হয়ে উঠেচে। এতদিন
পরে আকাশে একটি পাখা দেখতে পেলুম—এই পাখীগুলিই
পৃথিবীর বাণী আকাশে বহন করে নিয়ে যায়—আকাশ দেয়
তার আলো, পৃথিবী দেয় তার গান। সমুদ্রের যা'—কিছু গান
সে কেবল তার নিজের চেউয়ের—তার কোলে জীব আছে
যথেষ্ট, পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কারো কণ্ঠে
স্বর নেই—সেই অসংখ্য বোবা জীবের হয়ে সমুদ্র নিজেই কথা
কছে। ডাঙার জীবেরা প্রধানত শব্দের দ্বারাই মনের ভাব
প্রকাশ করে, জলচরদের ভাষা হচ্ছে গতি। সমুদ্র হচ্ছে
নৃত্যলোক, আর পৃথিবী হচ্ছে শব্দলোক।

আজ বিকেলে চারটে পাঁচটার সময় রেঙ্গুনে পৌঁছবার কথা।
মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্য্যন্ত পৃথিবীতে নানা খবর চলাচল
করছিল, আমাদের জন্মে সেগুলো সমস্ত জমে রয়েছে ;—

বাণিজ্যের ধনের মত নয় প্রতিদিন যার হিসাব চলে ; কোম্পানির কাগজের মত, অগোচরে যার মূল জন্মে ।

২৪শে বৈশাখ, ১৩২৩ ।

৪

২৪শে বৈশাখ অপরাহ্নে রেঙ্গুনে পৌঁছন গেল ।

চোখের পিছনে চেয়ে দেখার একটা পাকযন্ত্র আছে, সেইখানে দেখাগুলো বেশ করে' হজম হয়ে না গেলে সেটাকে নিজের করে' দেখানো যায় না । তা' নাইবা দেখানো গেল—এমন কথা কেউ বলতে পারেন । যেখানে যাওয়া গেছে সেখানকার মোটামুটি বিবরণ দিতে দোষ কি ?

দোষ না থাকতে পারে,—কিন্তু আমার অভ্যাস অন্তরকম । আমি টুঁকে যেতে টেঁকে যেতে পারিনে । কখনো কখনো নোট নিতে ও রিপোর্ট দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছি, কিন্তু সে সমস্ত টুকরো কথা আমার মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে ছড়িয়ে পড়ে যায় । প্রত্যক্ষটা একবার আমার মনের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষ হয়ে গিয়ে তার পরে যখন প্রকাশের মঞ্চ এসে দাঁড়ায় তখনই তার সঙ্গে আমার ব্যবহার ।

ছুটেতে ছুটেতে তাড়াতাড়ি দেখে দেখে বেড়ানো আমার পক্ষে ক্লান্তিকর এবং নিষ্ফল । অতএব আমার কাছ থেকে বেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত তোমরা পাবে না । আদালতে সত্যপাঠ করে'

আমি সাক্ষী দিতে পারি যে, রেঙ্গুন নামক এক সহরে আমি এসেছিলুম; কিন্তু যে আদালতে আরো বড় রকমের সভ্যপাঠ করতে হয়, সেখানে আমাকে বলতেই হবে রেঙ্গুনে এসে পৌঁছই নি।

এমন হতেও পারে রেঙ্গুন সহরটা খুব একটা সভ্য বস্তু নয়। রাস্তাগুলি সোজা, চওড়া, পরিষ্কার, বাড়িগুলি তক্তক্ করতে, রাস্তায় ঘাটে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে হঠাৎ কোথাও যখন রঙীন রেশমের কাপড়-পরা ব্রহ্মদেশের পুরুষ বা মেয়ে দেখতে পাই, তখন মনে হয় এরাই বুদ্ধি বিদেশী। আসল কথা গঙ্গার পুলটা যেমন গঙ্গার নয়, বরঞ্চ সেটা গঙ্গার গলার ফাঁসি—রেঙ্গুন সহরটা তেমনি ব্রহ্মদেশের সহর নয়, ওটা যেন সমস্ত দেশের প্রতিবাদের মত।

প্রথমত ইরাবতী নদী দিয়ে সহরের কাছাকাছি যখন আসছি, তখন ব্রহ্মদেশের প্রথম পরিচয়টা কি? দেখি তীরে বড় বড় সব কেরোসিন তেলের কারখানা লম্বা লম্বা চিমনি আকাশে তুলে দিয়ে ঠিক যেন চিং হয়ে পড়ে বস্মা চুরুট খাচ্ছে। তার পরে যত এগোতে থাকি, দেশ বিদেশের জাহাজের ভিড়। তারপর যখন ঘাটে এসে পৌঁছই, তখন তট বলে পদার্থ দেখা যায় না—সারি সারি জেটিগুলো যেন বিকটাকার লোহার জেঁকের মত ব্রহ্মদেশের গায়ে একবারে হেঁকে ধরেছে। তারপরে আপিস, আদালত, দোকান, বাজারের মধ্যে দিয়ে আমার বাঙালী বন্ধুদের বাড়ীতে গিয়ে উঠলুম, কোনো কঁাক

দিয়ে ব্রহ্মদেশের কোনো চেহারাই দেখতে পেলুম না। মনে হল রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশের ম্যাপে আছে, কিন্তু দেশে নেই। অর্থাৎ এ সহর দেশের মাটি থেকে গাছের মত ওঠে নি, এ সহর কালের স্রোতে ফেনার মত ভেসেছে,—সুতরাং এর পক্ষে এ জায়গাও যেমন, অণ্ড জায়গাও তেমনি।

আসল কথা পৃথিবীতে যে-সব সহর সত্য তা' মানুষের মমতার দ্বারা তৈরি হয়ে উঠেছে। দিল্লি বল, আগ্রা বল, কাশী বল, মানুষের আনন্দ তাকে সৃষ্টি করে তুলেছে। কিন্তু বাণিজ্য-লক্ষ্মী নির্মম, তার পায়ে নীচে মানুষের মানস-সরোবরের সৌন্দর্য-শতদল কোটে না। মানুষের দিকে সে তাকায় না, সে কেবল দ্রব্যকে চায়,—যন্ত্র তার বাহন। গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আসছিল, তখন বাণিজ্যশ্রীর নির্লজ্জ নির্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখতে দেখতে এসেছি। ওর মনে প্রীতি নেই বলেই বাংলা দেশের এমন সুন্দর গঙ্গার ধারকে এত অনায়াসে নষ্ট করতে পেরেছে।

আমি মনে করি আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, কদর্যতার লৌহ-বস্ত্রা যখন কলকাতার কাছাকাছি দুই তীরকে, মেটেবুরুজ থেকে হুগলি পর্যন্ত, গ্রাস করবার জন্মে ছুটে আসছিল, আমি তার আগেই জন্মেছি। তখনো গঙ্গার ঘাটগুলি গ্রামের নিকট বাহর মত গঙ্গাকে বুকের কাছে আপন করে ধরে রেখেছিল, কুঠির নোকাগুলি তখনো সন্ধ্যাবেলায় তীর তীরে ঘাটে ঘাটে ঘরের লোকগুলিকে ধরে ধরে কিরিয়ে আনত। একদিকে

দেশের হৃদয়ের ধারা, আর একদিকে দেশের এই নদীর ধারা, এর মাঝখানে কোনো কঠিন কুৎসিৎ বিচ্ছেদ দাঁড়ায় নি।

তখনো কলকাতার আশেপাশে বাংলাদেশের যথার্থ রূপটিকে দুই চোখ ভরে' দেখবার কোনো বাধা ছিল না। সেই জন্মেই কলকাতা আধুনিক সহর হলেও, কোকিল শিশুর মত তার পালন-কর্ত্রীর নীড়কে একেবারে রিক্ত করে' অধিকার করে নি। কিন্তু তারপরে বাণিজ্য-সভ্যতা যতই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল, ততই দেশের রূপ আচ্ছন্ন হতে চলল। এখন কলকাতা বাংলা দেশকে আপনার চারিদিক থেকে নির্বাসিত করে' দিচ্ছে— দেশ ও কালের লড়াইয়ে দেশের শ্যামল শোভা পরাভূত হল, কালের করাল মূর্তিই লোহার দাঁত নখ মেলে' কালো নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল।

এক সময়ে মানুষ বলেছিল, “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ”। তখন মানুষ লক্ষ্মীর যে-পরিচয় পেয়েছিল সে ত কেবল ঐশ্বর্য্যে নয়, তার সৌন্দর্য্যে। তার কারণ, বাণিজ্যের সঙ্গে তখন মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ ঘটে নি। তাঁতের সঙ্গে তাঁতীর, কামারের হাতুড়ির সঙ্গে কামারের হাতের, কারিগরের সঙ্গে তার কারু-কার্য্যের মনের মিল ছিল। এইজন্মে বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে মানুষের হৃদয় আপনাকে ঐশ্বর্য্যে বিচিত্র করে সুন্দর করে ব্যক্ত করত। নইলে লক্ষ্মী তাঁর পদ্মাসন পেতেন কোথা থেকে? যখন থেকে কল হল বাণিজ্যের বাহন, তখন থেকে বাণিজ্য হল শ্রীহীন। প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেষ্টরের তুলনা

করলেই তুফাংটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। ভেনিসে সৌন্দর্য্যে এবং ঐশ্বর্য্যে মানুষ আপনারই পরিচয় দিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টরে মানুষ সব দিকে আপনাকে খর্ব্ব করে আপনার কলের পরিচয় দিয়েছে। এই জন্ম কল-বাহন বাণিজ্য যেখানেই গেছে সেখানেই আপনার কালিমায় কদর্য্যতায় নিশ্চয়মতায় একটা লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে। তাই নিয়ে কাটাকাটি হানাহানির আর অন্ত নেই; তাই নিয়ে অসত্যে লোকালয় কলঙ্কিত এবং রক্তপাতে ধরাতল পঙ্কিল হয়ে উঠল। অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী; তাঁর অন্ন পরিবেষণের হাতা আজ হয়েছে রক্তপান করবার খর্পর। তাঁর শ্মিতহাস্ত আজ অট্টহাস্তে ভীষণ হল। যাই হোক, আমার বলবার কথা এই যে, বাণিজ্য মানুষকে প্রকাশ করে না, মানুষকে প্রচ্ছন্ন করে।

তাই বল্চি, রেঙ্গুন ত দেখলুম কিন্তু সে কেবল চোখের দেখা, সে দেখার মধ্যে কোন পরিচয় নেই;—সেখান থেকে আমার বাঙালী বন্ধুদের আতিথ্যের স্মৃতি নিয়ে এসেছি, কিন্তু ব্রহ্মদেশের হাত থেকে কোনো দক্ষিণা আনতে পারি নি। কথাটা হয়ত একটু অভ্যুক্তি হয়ে পড়ল। আধুনিকতার এই প্রাচীরের মধ্যে দেশের একটা গবাক্ হঠাৎ একটু খোলা পেয়েছিলুম। সোমবার দিনে সকালে আমার বন্ধুরা এখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে একটা কিছু দেখতে পেলুম। এতক্ষণ যার মধ্যে ছিলুম সে একটা এবস্ট্রাকশন্ সে একটা আচ্ছন্ন পদার্থ। সে

একটা সহর, কিন্তু কোনো-একটা সহরই নয়। এখন যা দেখছি, তার নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে। তাই সমস্ত মন খুঁসি হয়ে, সজাগ হয়ে উঠল। আধুনিক বাঙালীর ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশানওয়ালা মেয়ে দেখতে পাই; তারা খুব গটগট করে' চলে, খুব চটপট করে ইংরেজি কয়—দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে,—মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড় করে দেখছি, বাঙালীর মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশানজালমুক্ত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালী-ঘরের কল্যাণীকে দেখলে তখনি বুঝিতে পারি এ ত মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মত এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টলমল করচে। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগল; মনে হল, যাই হোক না কেন, এটা কাঁকা নয়—যেটুকু চোখে পড়চে এ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন সহরটা এর কাছে ছোট হয়ে গেল—বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।

প্রথমেই বাইরের প্রথর আলো থেকে একটি পুরাতন কালের পরিণত ছায়ার মধ্যে এসে প্রবেশ করলুম। থাকে থাকে প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে চলেচে—তার উপরে আচ্ছাদন। এই সিঁড়ির দুই ধারে ফল, ফুল, বাতি, পূজার অর্ঘ্য বিক্রি চলচে। যারা বেছে তারা অধিকাংশই ব্রহ্মীয় মেয়ে। ফুলের রঙের সঙ্গে তাদের রেশমের কাপড়ের রঙের মিল হয়ে মন্দিরের ছায়াটি

সূর্যাস্তের আকাশের মত বিচিত্র হয়ে উঠেছে। কেনাবেচার কোন নিষেধ নেই, মুসলমান দোকানদারেরা বিলাতি মণিহারির দোকান খুলে বসে গেছে। মাছ মাংসেরও বিচার নেই, চারিদিকে খাওয়া দাওয়া ঘরকন্মা চলছে। সংসারের সঙ্গে মন্দিরের সঙ্গে ভেদমাত্র নেই—একেবারে মাখামাখি। কেবল, হাটবাজারে যেরকম গোলমাল, এখানে তা' দেখা গেল না। চারিদিক নিরালা নয়, অথচ নিভৃত; শুষ্ক নয়, শান্ত। আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশীয় একজন ব্যারিষ্ঠার ছিলেন, এই মন্দির সোপানে মাছ-মাংস কেনাবেচা এবং খাওয়া চলছে, এর কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, বুদ্ধ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন—তিনি বলে' দিয়েছেন কিসে মানুষের কল্যাণ, কিসে তার বন্ধন; তিনি ত জোর করে কারো ভালো করতে চান নি; বাহিরের শাসনে কল্যাণ নেই, অন্তরের ইচ্ছাতেই মুক্তি; এই জন্মে আমাদের সমাজে বা মন্দিরে আচার সম্বন্ধে জবরদস্তি নেই।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেখানে গেলুম সেখানে খোলা জায়গা, তারই নানাস্থানে নানারকমের মন্দির। সে মন্দিরে গান্ধীর্ষ্য নেই, কারুকার্যের ঠেসাঠেসি ভিড়—সমস্ত যেন ছেলেমানুষের খেলনার মত। এমন অদ্ভুত পাঁচমিশালি ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায় না—এ যেন ছেলে-ভুলোনো ছড়ার মত; তার ছন্দটা একটানা বটে, কিন্তু তার মধ্যে যা'-খুসি-তাই এসে পড়েছে, তাবে পরস্পর-সামঞ্জস্যের কোনো দরকার নেই। বহুকালের পুরাতন শিল্পের সঙ্গে এখানকার নিতান্ত সস্তাদরের তুচ্ছতা

একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ভাবের অসঙ্গতি বলে যে কোনো পদার্থ আছে, এরা তা' যেন একেবারে জানেই না। আমাদের কলকাতায় বড়মানুষের ছেলের বিবাহ-যাত্রায় রাস্তা-দিয়ে যেমন সকল রকমের অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের বস্তু বয়ে যায়—কেবলমাত্র পুঞ্জীকরণটাই তার লক্ষ্য, সজ্জীকরণ নয়,—এও সেই রকম। এক ঘরে অনেকগুলো ছেলে থাকলে যেমন গোলমাল করে, সেই গোলমাল করাতেই তাদের আনন্দ—এই মন্দিরের সাজসজ্জা, প্রতিমা, নৈবেদ্য, সমস্ত যেন সেইরকম, ছেলেমানুষের উৎসব—তার মধ্যে অর্থ নেই, শব্দ আছে। মন্দিরের ঐ সোনা-বাঁধানো পিতল-বাঁধানো চূড়াগুলি ব্রহ্মদেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দের উচ্চহাস্য মিশ্রিত হো হো শব্দ—আকাশে ঢেউ খেলিয়ে উঠে। এদের যেন বিচার করবার, গম্ভীর হবার ব্যস হয়নি। এখানকার এই রঙিন মেয়েরাই সব চেয়ে চোখে পড়ে। এদেশের শাখাপ্রশাখা ভরে এরা যেন ফুল ফুটে রয়েছে। ভূঁইটাপার মত এরাই দেশের সমস্ত—আর কিছু চোখে পড়ে না।

লোকের কাছে শুনতে পাই, এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরামপ্রিয়; অগ্ন্য দেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই এখানে মেয়েরা করে থাকে। হঠাৎ মনে আসে এটা বুঝি মেয়েদের উপরে জুলুম করা হয়েছে। কিন্তু ফলে ত তার উন্টেই দেখতে পাচ্ছি—এই কাজকর্মের হিল্লোলে মেয়েরা আরো যেন বেশি করে' বিকশিত হয়ে উঠেছে। কেবল বাইরে

বেরতে পারাই যে মুক্তি তা' নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড় মুক্তি। পরাধীনতাই সব চেয়ে বড় বন্ধন নয়, কাজের সঙ্কীর্ণতাই হচ্ছে সব চেয়ে কঠোর খাঁচা।

এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এমন পূর্ণতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সঙ্কুচিত হয়ে নেই। রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেমসী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীরসী। কাজেই যে মেয়েদের ষথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা' আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম। তারা কঠিন পরিশ্রম করে—কিন্তু কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্তিটিকে সুব্যক্ত করে' তোলে তেমনি এই পরিশ্রমের আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ এমন নিটোল, এমন সুব্যক্ত হয়ে ওঠে, তাদের সকল প্রকার গতিভঙ্গীতে এমন একটা মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায়। কবি কীট্‌স্ বলেছেন, সত্যই সুন্দর। অর্থাৎ সত্যের বাধ্যমুক্ত সুসম্পূর্ণতাতেই সৌন্দর্য্য। সত্য মুক্তি লাভ করলে আপনিই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকাশের পূর্ণতাই সৌন্দর্য্য, এই কথাটাই আমি উপনিষদের এই বাণীতে অনুভব করি—আনন্দ-রূপমমৃতং ষদিভাতি; অনন্তস্বরূপ যেখানে প্রকাশ পাচ্ছেন, সেইখানেই তাঁর অমৃতরূপ আনন্দরূপ। মানুষ ভয়ে, লোভে, ঈর্ষায় মুচতায়, প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণতায় এই প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে, বিকৃত করে; এবং সেই বিকৃতিকেই

অনেক সময় বড় নাম দিয়ে বিশেষ ভাবে আদর করে থাকে।

তোসা-মারু জাহাজ,
২৭শে বৈশাখ, ১৩২৩।

৫

২৯ বৈশাখ। বিকেলের দিকে যখন পিনাঙের বন্দরে ঢুকছি, আমাদের সঙ্গে যে বালকটি এসেছে, তার নাম মুকুল, সে বলে উঠল, ইকুলে একদিন পিনাং সিঙাপুর মুখস্থ করে মরেচি—এ সেই পিনাং। তখন আমার মনে হল ইকুলের ম্যাপে পিনাং দেখা যেমন সহজ ছিল, এ তার চেয়ে বেশি শক্ত নয়। তখন মার্কটার ম্যাপে আঙুল বুলিয়ে দেশ দেখাতেন, এ হচ্ছে জাহাজ বুলিয়ে দেখানো।

এরকম ভ্রমণের মধ্যে “বস্তুতন্ত্রতা” খুব সামান্য। বসে বসে স্বপ্ন দেখবার মত। না করচি চেষ্টা, না করচি চিন্তা, চোখে সামনে আপনা আপনি সব জেগে উঠে। এই সব ভ্রমণের করতে, এর পথ ঠিক করে রাখতে, এর রাস্তাঘাট পাকা করে তুলতে, অনেক মানুষকে অনেক ভ্রমণ এবং অনেক দুঃসাহস করতে হয়েছে, আমরা সেই সমস্ত ভ্রমণ ও দুঃসাহসের বোতলে-ভরা মোরক্বা উপভোগ করচি যেন। এতে কোন কাঁটা নেই, খোসা নেই, আঁটি নেই,—কেবল শাঁসটুকু আছে,

আর তার সঙ্গে যতটা সম্ভব চিনি মেশানো। অকূল সমুদ্র কূলে কূলে উঠে, দিগন্তের পর দিগন্তের পর্দা উঠে উঠে যাচ্ছে, দুর্গমতার একটা প্রকাণ্ড মূর্তি চোখে দেখতে পাচ্ছি; অথচ আলিপুরে খাঁচার সিংহটার মত তাকে দেখে আমোদ বোধ করছি; ভীষণও মনোহর হয়ে দেখা দিচ্ছে।

আরব্য-উপন্যাসে আলাদিনের প্রদীপের কথা যখন পড়ে-ছিলুম, তখন সেটাকে ভারি লোভনীয় মনে হয়েছিল। এ ত সেই প্রদীপেরই মায়ী। জলের উপরে স্থলের উপরে সেই প্রদীপটা ঘস্চে, আর অদৃশ্য দৃশ্য হচ্ছে, দূর নিকটে এসে পড়চে। আমরা এক জায়গায় বসে আছি, আর জায়গাগুলোই আমাদের সামনে এসে পড়চে।

কিন্তু মানুষ কলটাকেই যে মুখ্যভাবে চায় তা নয়, ফলিয়ে তোলানোটাই তার সব চেয়ে বড় জিনিষ। সেই জন্যে, এই যে ভ্রমণ করছি, এর মধ্যে মন একটা অনুভব করচে—সেটি হচ্ছে এই যে, আমরা ভ্রমণ করচিনে। সমুদ্রপথে আসতে আসতে মাঝে মাঝে দূরে দূরে এক-একটা পাহাড় দেখা দিচ্ছিল, আগাগোড়া গাছে ঢাকা; ঠিক যেন কোন্ দানবলোকের প্রকাণ্ড জন্তু তার কোঁকড়া সবুজ রোঁয়া নিয়ে সমুদ্রের ধারে বিমতে বিমতে রোদ পোয়াচ্ছে; মুকুল তাই দেখে বলে ঐখানে নেবে যেতে ইচ্ছা করে। ঐ ইচ্ছাটা হচ্ছে সত্যকার ভ্রমণ করবার ইচ্ছা। অশু কৰ্তৃক দেখিয়ে দেওয়ার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে নিজে দেখার ইচ্ছা। ঐ পাহাড়-ওয়ানা ছোট ছোট

দ্বীপগুলোর নাম জানিনে ; ইস্কুলের ম্যাপে ও-গুলোকে মুখস্থ করতে হয় নি ; দূর থেকে দেখে মনে হয় ওরা একেবারে ভাঙ্গা রয়েছে, সাকুলেটিং লাইব্রেরির বইগুলোর মত মানুষের হাতে হাতে ফিরে নানা চিত্রে চিত্রিত হয়ে যায় নি ; সেই জন্মে মনকে টানে । (অন্তের পরে মানুষের বড় ঈর্ষা । যাকে আর কেউ পায় নি, মানুষ তাকে পেতে চায় । তাতে যে পাওয়ার পরিমাণ বাড়ে তা নয়, কিন্তু পাওয়ার অভিমান বাড়ে ।)

সূর্য্য যখন অস্ত যাচ্ছে, তখন পিনাটের বন্দরে জাহাজ এসে পৌঁছল । মনে হল বড় সুন্দর এই পৃথিবী । জলের সঙ্গে স্থলের যেন প্রেমের মিলন দেখলুম । ধরণী তার দুই বাহু মেলে সমুদ্রে আলিঙ্গন করতে । মেঘের ভিতর দিয়ে নীলাভ পাহাড়গুলির উপরে যে একটি সুকোমল আলো পড়চে সে যেন অতি সূক্ষ্ম সোনালি ঝড়ের ওড়নার মত—তাতে বধূর মুখ ঢেকেচে, না প্রকাশ করতে, তা' বলা যায় না । জলে স্থলে আকাশে মিলে এখানে সন্ধ্যাবেলাকার স্বর্ণতোরণের থেকে স্বর্গীয় নহরৎ বাজতে লাগল ।

পালতোলা সমুদ্রের নৌকাগুলির মত মানুষের সুন্দর সৃষ্টি অতি অল্পই আছে । (যেখানে প্রকৃতির ছন্দে মিলে মানুষকে চলতে হয়েছে. সেখানে মানুষের সৃষ্টি সুন্দর না হয়ে থাকতে পারে না ।) নৌকাকে জল বাতাসের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়েছে, এই জন্মেই জল বাতাসের শ্রীটুকু সে পেয়েচে । কল যেখানে নিজের জোরে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে, সেইখামেই

সেই ঔকতো মানুষের রচনা কুশ্রী হয়ে উঠতে লক্ষ্যমাত্র করে না। কলের জাহাজে পালের জাহাজের চেয়ে সুবিধা আছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই। জাহাজ যখন আস্তে আস্তে বন্দরের গা ঘেঁসে এল, যখন প্রকৃতির চেয়ে মানুষের দুশ্চেষ্টা বড় হয়ে দেখা দিল, কলের চিমনিগুলো প্রকৃতির বাঁকা ভঙ্গিমার উপর তার সোজা আঁচড় কাটতে লাগল, তখন দেখতে পেলুম মানুষের রিপু জগতে কি কুশ্রীতাই সৃষ্টি করচে। সমুদ্রের তীরে তীরে, বন্দরে বন্দরে, মানুষের লোভ কদর্যা ভঙ্গীতে স্বর্গকে ব্যঙ্গ করচে—এমনি করেই নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে।

তোসা-মারু, পিনাং বন্দর।

৬

২রা জ্যৈষ্ঠ। উপরে আকাশ, নীচে সমুদ্র। দিনে রাত্রে আমাদের দুই চক্ষুর বরাদ্দ এর বেশি নয়। আমাদের চোখ হুটো মা-পৃথিবীর আদর পেয়ে পেটুক হয়ে গেছে। তার পাতে নানা রকমের জোগান দেওয়া চাই। তার অধিকাংশই সে স্পর্শও করে না, ফেলা যায়। কত যে নষ্ট হচ্ছে বলা যায় না, দেখবার জিনিষ অতিরিক্ত পরিমাণে পাই বলেই দেখবার জিনিষ সম্পূর্ণ করে' দেখি নে। এই জন্মে মাঝে মাঝে আমাদের পটুক চোখের পক্ষে এই রকমের উপবাস ভালো।

আমাদের সামনে মস্ত দুটো ভোজের থালা, আকাশ আর সমুদ্র। অত্যাঁস দোষে প্রথমটা মনে হয় এ দুটো বুকি একে-বারে শূন্য থালা। তারপর চুই একদিন লঙ্ঘনের পর কুখা একটু বাড়লেই তখন দেখতে পাই, যা' আছে তা' নেহাৎ কম নয়। মেঘ ক্রমাগত নতুন নতুন রঙে সরস হয়ে আসচে, আলো ক্রমে ক্রমে নতুন নতুন স্বাদে আকাশকে এবং জলকে পূর্ণ করে তুলচে।

আমরা দিনরাত পৃথিবীর কোলে কাঁখে থাকি বলেই আকাশের দিকে তাকাইনে, আকাশের দিগ্বসনকে বলি উলঙ্গতা। যখন দীর্ঘকাল ঐ আকাশের সঙ্গে মুখোমুখি করে থাকতে হয়, তখন তা'র পরিচয়ের বিচিত্রতায় অবাক হয়ে থাকি। ওখানে মেঘে মেঘে রূপের এবং রঙের অহেতুক বিকাশ। এ যেন গানের আলাপের মত, রূপ-রঙের রাগরাগিণীর আলাপ চলচে—তাল নেই, আকার আয়তনের বাঁধাবাঁধি নেই, কোনো অর্থবিশিষ্ট বাণী নেই, কেবলমাত্র মুক্ত সুরের লীলা। সেই সঙ্গে সমুদ্রের অপর-নৃত্য ও মুক্ত ছন্দের নাচ। তার মদস্বে যে বোল বাজচে তার ছন্দ এমন বিপুল যে, তার লয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে নৃত্যের উল্লাস আছে, অথচ নৃত্যের নিয়ম নেই।

এই বিরাট রঙ্গশালায় আকাশ এবং সমুদ্রের যে রঙ্গ, সেইটি দেখবার শক্তি ক্রমে আমাদের বেড়ে ওঠে। জগতে যা' কিছু মহান, তার চারিদিকে একটা বিরলতা আছে, তার পট-ভূমিকা

(back ground) সামান্য। সে আপনাকে দেখাবার জন্যে আর কিছু সাহায্য নিতে চায় না। নিশীথের নক্ষত্রলতা অসীম অক্ষকারের অবকাশের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। এই নক্ষত্র-আকাশের যে বৃহৎ প্রকাশ, সেও বহু-উপকরণের দ্বারা আপন মর্যাদা নষ্ট করে না। এরা হল জগতের বড় ওস্তাদ, লোকলায় আমাদের মন ভোলাতে এরা অবজ্ঞা করে। মনকে প্রজ্ঞাপূর্বক আপন হতে অগ্রসর হয়ে এদের কাছে যেতে হয়। যখন নানা ভোগে জীর্ণ হয়ে অলস এবং “অনুধাবৃষ্টি” হয়ে থাকে, তখন এই ওস্তাদের আলাপ তার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান।

আমাদের সুবিধে হয়েছে, সামনে আমাদের আর কিছু নেই। অন্তরালে যখন বিলিতি যাত্রী-জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দেয়, তখন যাত্রীরাই ছিল এক দৃশ্য। তারা নাচে গানে আলায় গোলেমালে অনন্তকে আচ্ছন্ন করে রাখত। এক হৃৎকণ্ডে তারা ফাঁকা ফেলে রাখতে চাইত না। তার উপরে জসজ্জা, কায়দাকামনের উপসর্গ ছিল। এখানে জাহাজের কের সঙ্গে সমুদ্র আকাশের কোনো প্রতিযোগিতা নেই। ত্রীর সংখ্যা অতি সামান্য, আমরাই চারজন; বাকী দু-তিন। ধীর প্রকৃতির লোক। তারপরে ঢিলাঢালা বেশেই যুচ্চি, গচ্চি, খেতে যাচ্চি, কারো কোনো আপত্তি নেই; তার প্রধান রণ, এমন কোনো মহিলা নেই, আমাদের অপরিচ্ছন্নতার। অসম্মত হতে পারে।

এই জন্মেই প্রতিদিন আমরা বুঝতে পারছি, জগতে সূর্যো-
দয় ও সূর্যাস্ত সামান্য ব্যাপার নয়, তার অভ্যর্থনার জন্মে স্বর্গ
মর্ত্যে রাজকীয় সমারোহ। প্রভাতে পৃথিবী তার ঘোমটা খুলে
দাঁড়ায়, তার বাণী নানা সুরে জেগে উঠে; সন্ধ্যায় স্বর্গলোকের
যবনিকা উঠে যায়, এবং ছালোক আপন জ্যোতি-রোমাঞ্চিত
নিঃশব্দতার দ্বারা পৃথিবীর সম্ভাষণের উত্তর দেয়। স্বর্গমর্ত্যের
এই মুখোমুখি আলাপ যে কত গম্ভীর এবং কত মহীয়ান, এই
আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা' আমরা বুঝতে পারি।

দিগন্ত থেকে দেখতে পাই মেঘগুলো নানা ভঙ্গীতে আকাশে
উঠে চলেছে, যেন সৃষ্টিকর্তার আঙিনার আকার-কোয়ারার মুখ
খুলে গেছে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনটার
সঙ্গে কোনটার মিল নেই। নানা রকমের আকার;—কেবল
সোজা লাইন নেই। সোজা লাইনটা মানুষের হাতের কাজের।
তার ঘরের দেওয়ালে, তার কারখানা-ঘরের চিম্নিতে মানুষের
জয়স্তুম্ভ একেবারে সোজা খাড়া। বাঁকা রেখা জীবনের রেখা,
মানুষ সহজে তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। সোজা রেখা
জড় রেখা, সে সহজেই মানুষের শাসন মানে; সে মানুষের
বোঝা বয়, মানুষের অত্যাচার নয়।

যেমন আকৃতির হরির লুঠ, তেমনি রঙের। রং যে কত-
রকম হতে পারে, তার সীমা নেই। রঙের তান উঠে, তানের
উপর তান; তাদের মিলও যেমন, তাদের অমিলও তেমনি;
তারা বিরুদ্ধ নয়, অথচ বিচিত্র। রঙের সমারোহেও যেমন

প্রকৃতির বিলাস, রঙের শান্তিতেও তেমনি। সূর্যাস্তের মুহূর্তে পশ্চিম আকাশ যেখানে রঙের ঐশ্বর্য্য পাগলের মত দুই হাতে বিনা প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিচ্ছে সেও যেমন আশ্চর্য্য, পূর্ব আকাশে যেখানে শান্তি এবং সংযম, সেখানেও রঙের পেলবতা, কোমলতা, অপরিমেয় গভীরতা তেমনি আশ্চর্য্য। প্রকৃতির হাতে অপ-
র্য্যাপ্তও যেমন মহৎ হতে পারে, পর্য্যাপ্তও তেমনি; সূর্য্যাস্তে সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতি আপনার ডাইনে বাঁয়ে একই কালে সেটা দেখিয়ে দেয়; তার খেয়াল আর ক্রপদ একই সঙ্গে বাজতে থাকে, অথচ কেউ কারো মহিমাকে আঘাত করে না।

তার পরে, রঙের আভায়-আভায় জল যে কত বিচিত্র কথাই বলতে পারে তা' কেমন করে বর্ণনা করব। সে তার জল-
তরঙ্গে রঙের যে গৎ বাজাতে থাকে, তাতে সুরের চেয়ে শ্রুতি অসংখ্য। আকাশ যে সময়ে তার প্রশান্ত স্তব্ধতার উপর রঙের মহতোমহীয়ানকে দেখায়, সমুদ্র সেই সময় তার ছোট ছোট লহরীর কম্পনে রঙের অণোরণীয়ানকে দেখাতে থাকে, তখন আশ্চর্য্যের অন্ত পাওয়া যায় না।

সমুদ্র আকাশের গীতিনাট্য-লীলায় রুদ্রের প্রকাশ কিরকম দেখা গেছে, সে পূর্বেই বলেছি। আবার কালও তিনি তাঁর ডমরু বাজিয়ে অট্টহাস্তে আর এক ভঙ্গীতে দেখা দিয়ে গেলেন। সকালে আকাশ জুড়ে নীল মেঘ এবং ধোঁয়ালো মেঘ স্তরে স্তরে পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে ফুলে উঠল। মুবলধারে বৃষ্টি। বিদ্যুৎ আমাদের জাহাজের চারদিকে তার তলোয়ার খেলিয়ে বেড়াতে

লাগল। তার পিছনে পিছনে বাজের গর্জন। একটা বজ্র ঠিক আমাদের সামনে জলের উপর পড়ল, জল থেকে একটা বাষ্প-রেখা সাপের মত ফোঁস করে উঠল। আর একটা বজ্র পড়ল আমাদের সামনের মাস্তুলে। রুদ্র যেন সুইট্‌জারল্যান্ডের ইতিহাস-বিশ্রুত বীর উইলিয়ম টেলের মত তাঁর অদ্ভুত ধনুর্বিছার পরিচয় দিয়ে গেলেন, মাস্তুলের ডগাটায় তাঁর বাণ লাগল, আমাদের স্পর্শ করল না। এই বাড়ে আমাদের সঙ্গী আর একটা জাহাজের প্রধান মাস্তুল বিদীর্ণ হয়েছে শুনলুম। মানুষ যে বাঁচে এই আশ্চর্য্য।

৭

এই কয়দিন আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চোখ ভরে দেখছি, আর মনে হচ্ছে অস্তরের রং ত শুভ্র নয়, তা কালো কিম্বা নীল। এই আকাশ খানিক দূর পর্য্যন্ত আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ—ততটা সে সাদা। তারপরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যতদূর, সীমার রাজ্য সেই পর্য্যন্ত; তারপরেই অসীম অন্ধকার। সেই অসীম অন্ধকারের বুকের উপরে এই পৃথিবীর আলোকময় দিনটুকু যেন কৌস্তভমণির হার ছুঁতে।

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ পরে' অভিসারে চলেচে—ঐ কালোর দিকে, ঐ অনির্বচনীয় অব্যক্তের দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকতেই তার মরণ—সে কুলকেই সর্ব্বস্ব করে চুপ করে বসে থাকতে পারে

না, সে কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা, পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি,—সমস্তকে অতিক্রম করে, বিপদকে উপেক্ষা করে সে যে চলেছে, সে কেবল ঐ অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তের দিকে, “আরোর” দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসার-যাত্রা,—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্ দিকে চলে, ওদিকে ত পথের চিহ্ন নেই, কিছু ত দেখতে পাওয়া যায় না?—না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত। কিন্তু শূন্য ত নয়,—কেননা ঐ দিক থেকেই বাঁশির সুর আসছে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে চলি, সে ত বুদ্ধিমানের চলা,—তার হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে; সে ঘুরে ঘুরে কুলের মধ্যেই চলা। সে চলায় কিছুই এগোয় না। আর যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হয়ে চলি, যে চলায় মরা বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেছে। সেই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চলতে হয়, কোনো নজির মানতে গেলেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজার রকম যুক্তি আছে, সে যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না; তার এই চলার কেবল একটি-মাত্র কৈফিয়ৎ আছে,—সে বল্চে ঐ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাকছে। নইলে কেউ কি সাধ করে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে?

যেদিক থেকে ঐ মনোহরণ অঙ্ককারের বাঁশি বাজ্চে, ঐ দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ কিরিয়ে আছে ; ঐ দিকে চেয়েই মানুষ রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিরাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় করে নিয়েচে। ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভুলেচে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে টানে, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে ঘুরে বেড়ায়, বারবার মরতে মরতে সমুদ্র-পারের পথ বের করে, বারবার মরতে মরতে আকাশ-পারের ডানা মেলতে থাকে।

মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী, তারাই এগছে, —ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্বনাশা কালোর বাঁশি শুনতে পেলেনা, তারা কেবল পুঁথির নজির জড় করে কুল অঁকড়ে বসে রইল—তারা কেবল শাসন মানতেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দলোকে জন্মেচে, যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিভা লালাই হচ্ছে জীবনযাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্ছে বিধি।

আবার উন্টেদিক থেকে দেখলে দেখতে পাই, ঐ কালো অনন্ত আস্চেন তাঁর আপনার শুভ্র জ্যোতির্শ্রয়ী আনন্দমূর্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই সুন্দরীর জন্মে, সেই জন্মেই তাঁর বাঁশি বিরাট অঙ্ককারের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে

বাজতে, অসীমের সাধনা এই স্তম্ভরীকে নূতন নূতন মালায় নূতন করে সাজাচ্ছে। ঐ কালো এই রূপসীকে এক মুহূর্ত্ত বুকের থেকে নামিয়ে রাখতে পারেন না,—কেননা এ যে তাঁর পরমা সম্পদ। ছোটর জন্মে বড়র এই সাধনা যে কি অসীম, তা ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে, পাখীর পাখায় পাখায়, মেঘের রঙে রঙে, মানুষের হৃদয়ের অপরূপ লাবণ্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধরা পড়চে। রেখায় রেখায়, রঙে রঙে, রসে রসে তৃপ্তির আর শেষ নেই। এই আনন্দ কিসের?—অব্যক্ত যে ব্যক্তর মধ্যে কেবলই আপনাকে প্রকাশ কর্চেন, আপনাকে ত্যাগ করে করে ফিরে পাচ্চেন।

এই অব্যক্ত কেবলি যদি না-মাত্র, শূন্যমাত্র হতেন,—তাহলে প্রকাশের কোনো অর্থই থাকত না, তাহলে বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি কেবল একটা শব্দমাত্র হত। ব্যক্ত যদি অব্যক্তেরই প্রকাশ না হত, তাহলে যা-কিছু আছে তা নিশ্চল হয়ে থাকত, কেবলি আরো কিছুর দিকে আপনাকে নূতন করে তুলত না। এই আরো-কিছুর দিকেই সমস্ত জগতের আনন্দ কেন—এই অজানা আরো-কিছুর বাঁশি শুনেই সে কুল ত্যাগ করে কেন? ঐ দিকে শূন্য নয় বলেই, ঐ দিকেই সে পূর্ণকে অনুভব করে বলেই। সেই জন্মই উপনিষদ বলেচেন—ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিত্বাঃ। সেই জন্মই ত সৃষ্টির এই লীলা দেখ্চি, আলো এগিয়ে চলেচে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আস্চে আলোয় কূলে। আলোর মন ভুলচে কালোয়, কালোর মন ভুলচে আলোয়।

মানুষ যখন জগৎকে না-এর দিক থেকে দেখে, তখন তার রূপক একেবারে উন্টে যায়। প্রকাশের একটা উন্টো পিঠ আছে, সে হচ্ছে প্রলয়। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ছাড়া প্রাণের বিকাশ হতেই পারে না। হয়ে-ওঠার মধ্যে দুটো জিনিস থাকাই চাই,—যাওয়া এবং হওয়া। হওয়াটাই হচ্ছে মুখ্য, যাওয়াটাই গৌণ।

কিন্তু মানুষ যদি উন্টো পিঠেই চোখ রাখে,—বলে সবই যাচ্ছে, কিছুই থাকছে না; বলে জগৎ বিনাশেরই প্রতিক্রম, সমস্তই মায়া, যা-কিছু দেখছি, এ সমস্তই “না”; তাহলে এই প্রকাশের রূপকেই সে কালো করে, ভয়ঙ্কর করে দেখে; তখন সে দেখে, এই কালো কোথাও এগচ্ছে না, কেবল বিনাশের বেশে নৃত্য করছে। আর অনন্ত রয়েছেন আপনাতে আপনি নির্লিপ্ত, এই কালিমা তাঁর বুকের উপর মৃত্যুর ছায়ার মত চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু স্তব্ধকে স্পর্শ করতে পারছে না। এই কালো দৃশ্যত আছে, কিন্তু বস্তুত নেই—আর যিনি কেবলমাত্র আছেন, তিনি স্থির, ঐ প্রলয়রূপিনী না-থাকা তাঁকে লেশমাত্র বিচলিত করে না। এখানে আলোর সঙ্গে কালোর সেই সম্বন্ধ, থাকার সঙ্গে না-থাকার যে সম্বন্ধ। কালোর সঙ্গে আলোর আনন্দের মীলা নেই, এখানে যোগের অর্থ হচ্ছে প্রেমের যোগ নয়, জ্ঞানের যোগ। দুইয়ের যোগে এক নয়, একের মধ্যেই এক। মিলনে এক নয়, প্রলয়ে এক।

কথাটাকে আর একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করি।

একজন লোক ব্যবসা করচে। সে লোক করচে কি?—
 তার মূলধনকে, অর্থাৎ পাওয়া-সম্পদকে, সে মুনফা, অর্থাৎ
 না-পাওয়া সম্পদের দিকে প্রেরণ করচে। পাওয়া-সম্পদটা
 সীমাবদ্ধ ও ব্যক্ত, না-পাওয়া সম্পদটা অসীম ও অব্যক্ত।
 পাওয়া-সম্পদ সমস্ত বিপদ স্বীকার করে' না-পাওয়া সম্পদের
 অভিসারে চলেচে। না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে,
 কিন্তু তার ঘাঁশি বাজচে,—সেই বাঁশি ভূমার বাঁশি। যে বণিক
 সেই বাঁশি শোনে, সে আপন ব্যাঙ্কে জমানো কোম্পানি-কাগজের
 কুল ত্যাগ করে', সাগর গিরি ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে
 কি দেখ্‌চি?—না, পাওয়া-সম্পদের সঙ্গে না-পাওয়া সম্পদের
 একটি লাভের যোগ আছে। এই যোগে উভয়ত আনন্দ।
 কেননা, এই যোগে পাওয়া না-পাওয়াকে পাচ্ছে, এবং না-পাওয়া
 পাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত আপনাকেই পাচ্ছে।

কিন্তু মনে করা যাক্, একজন ভীতু লোক বণিকের খাতায়
 ঐ খরচের দিকের হিসাবটাই দেখ্‌চে। বণিক কেবলি আপনার
 পাওয়া-টাকা খরচ করেই চলেছে, তার অস্ত নেই। তার গা
 শিউরে ওঠে! সে বলে, এই ত প্রলয়! খরচের হিসাবের
 কালো অঙ্কগুলো রক্তনোলুপ রসনা ছুলিয়ে কেবলি যে নৃত্য
 কর্‌চে। যা খরচ,—অর্থাৎ বস্তুত যা নেই,—তাই প্রকাণ্ড
 প্রকাণ্ড অঙ্ক-বস্তুর আকার ধরে খাতা জুড়ে বেড়ে বেড়েই
 গলেচে। ঐকেই ত বলে মায়া। বণিক মুগ্ধ হয়ে এই মায়া-
 অঙ্কটির চিরদীর্ঘায়মান শৃঙ্খল কাটাতে পার্‌চে না। এস্থলে

মুক্তিটা কি?—না, ঐ সচল অক্ষগুলোকে একেবারে লোপ করে দিয়ে খাতার নিশ্চল নির্বিবকার শুভ্র কাগজের মধ্যে নিরাপদ ও নিরঙ্কন হয়ে স্থিরত্ব লাভ করা। দেওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে একটি আনন্দময় সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধ থাকার দরুণ মানুষ দুঃসাহসের পথে যাত্রা করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জয়লাভ করে, তীব্র মানুষ তাকে দেখতে পায় না। তাই বলে—

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা

ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

চীন সমুদ্র

তোমা-মারু

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

৮

শুনেছিলুম, পারস্যের রাজা যখন ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তখন হাতেখাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজকে বলেছিলেন, কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে গিয়ে তোমরা খাওয়ার একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হও। যারা ঘটকের হাত দিয়ে বিয়ে করে তারা কোর্টশিপের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করেই খাবারের সঙ্গে কোর্টশিপ আরম্ভ হয়। আঙুলের ডগা দিয়েই স্বাদগ্রহণের শুরু।

আমার ভেমনি জাহাজ থেকেই জাপানের স্বাদ শুরু হয়েছে।
• যদি করাসী জাহাজে করে জাপানে যেতুম, তাহলে আঙুলের
ডগা দিয়ে পরিচয় আরম্ভ হত না।

এর আগে অনেকবার বিলিতি জাহাজে করে সমুদ্র যাত্রা
করেছি—তার সঙ্গে এই জাহাজের বিস্তর তফাৎ। সে সব
জাহাজের কাপ্তেন ঘোরতর কাপ্তেন। যাত্রীদের সঙ্গে খাওয়া
দাওয়া হাসি তামাসা যে তার বন্ধ—তা নয়; কিন্তু কাপ্তেনীটা
খুব টকটকে রাঙা। এত জাহাজে আমি ঘুরেছি, তার মধ্যে
কোনো কাপ্তেনকেই আমার মনে পড়ে না। কেননা তারা
কেবলমাত্র জাহাজের অঙ্গ। জাহাজ-চালানোর মাঝখান দিয়ে
তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ।

হতে পারে আমি যদি যুরোপীয় হতুম, তাহলে তারা যে
কাপ্তেন ছাড়াও আর কিছু—তারা যে মানুষ—এটা আমার
অনুভব করতে বিশেষ বাধা হত না। কিন্তু এ জাহাজেও আমি
বিদেশী,—একজন যুরোপীয়ের পক্ষেও আমি যা, একজন
জাপানীর পক্ষেও আমি তাই।

এ জাহাজে চড়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কাপ্তেনের
কাপ্তেনীটা কিছুমাত্র লক্ষ্যগোচর নয়, একেবারেই সহজ মানুষ।
যাঁরা তাঁর নিম্নতর কর্মচারী, তাঁদের সঙ্গে তাঁর কর্মের সম্বন্ধ
এবং দূরত্ব আছে, কিন্তু যাত্রীদের সঙ্গে কিছুমাত্র নেই। ঘোরতর
ঝড়ঝাপটের মধ্যেও তাঁর ঘরে গেছি,—দিব্যি সহজ ভার।
কথায় বার্তায় ব্যবহারে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে জমে গিয়েছে,

সে কাপ্তেন-হিসাবে নয়, মানুষ-হিসাবে। এ যাত্রা আমাদের শেষ হয়ে যাবে, তাঁর সঙ্গে জাহাজ-চলার সম্বন্ধ আমাদের যুচে যাবে, কিন্তু তাঁকে আমাদের মনে থাকবে।

আমাদের ক্যাবিনের যে উয়ার্ড আছে, সেও দেখি তার কাজকর্মের সীমাটুকুর মধ্যেই শক্ত হয়ে থাকে না। আমরা আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা করছি, তার মাঝখানে এসে সেও ভাঙা ইংরাজিতে যোগ দিতে বাধা বোধ করে না। মুকুল ছবি আঁকচে, সে এসে খাতা চেয়ে নিয়ে তার মধ্যে ছবি আঁকতে লেগে গেল।

আমাদের জাহাজের যিনি খাজাঞ্চি, তিনি একদিন এসে আমাকে বলেন,—আমার মনে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন আসে, তোমার সঙ্গে তার বিচার করতে ইচ্ছে করি; কিন্তু আমি ইংরাজি এত কম জানি যে, মুখে মুখে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যদি কিছু না মনে কর, তবে আমি মাঝে মাঝে কাগজে আমার প্রশ্ন লিখে এনে দেব, তুমি অবসরমত সংক্ষেপে ছুঁচার কথায় তার উত্তর লিখে দিয়ো।—তারপাশ থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কি, এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রশ্নোত্তর চলচে।

অন্য কোন জাহাজের খাজাঞ্চি এই সব প্রশ্ন নিয়ে যে মাথা বকায়, কিম্বা নিজের কাজকর্মের মাঝখানে এরকম উপসর্গের সৃষ্টি করে, এরকম আমি মনে করতে পারিনে। এদের দেখে আমার মনে হয় এরা নূতন-জাগ্রত জাতি,—এরা সমস্তই নূতন

করে জানতে, নূতন করে ভাবতে উৎসুক। ছেলেরা নতুন জিনিস দেখলে যেমন ব্যগ্র হয়ে ওঠে, আইডিয়া সম্বন্ধে এসের যেন সেইরকম ভাব।

তা ছাড়া আর একটা বিশেষ এই যে, একপক্ষে জাহাজের যাত্রী, আর এক পক্ষে জাহাজের কর্মচারী, এর মারফাতকার গণ্ডিটা তেমন শক্ত নয়। আমি যে এই খাজাকির প্রসঙ্গের উত্তর লিখতে বসব, এ কথা মনে করতে তার কিছু বাধেনি,— আমি ছোটো কথা শুনতে চাই, তুমি ছোটো কথা বলবে; এতে কির কি আছে? মানুষের উপর মানুষের যে একটি দাবী আছে, সেই দাবীটা সরলভাবে উপস্থিত করলে মনের মধ্যে আপনি সাড়া দেয়, তাই আমি খুসি হয়ে আমার সাধ্যমত এই আলোচনায় যোগ দিয়েছি।

আর একটা জিনিস আমার বিশেষ করে চোখে লাগেঃ মুকুল বালকমাত্র, সে ডেকের প্যাসেঞ্জার। কিন্তু জাহাজের কর্মচারীরা তার সঙ্গে অবাধে বন্ধুত্ব করছে। কি করে জাহাজ চালায়, কি করে সমুদ্রে পথ নির্ণয় করে, কি করে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে হয়, কাজ করতে করতে তারা এই সমস্ত তাকে বোঝায়। তা ছাড়া নিজেদের কাজকর্ম আশান্তরসার কথাও ওর সঙ্গে হয়। মুকুলের সখ গেল, জাহাজের এঞ্জিনের ব্যাপার দেখবে। ওকে কাল রাত্রি এগারোটার সময় জাহাজের পাতালপুরীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে, এক ঘণ্টা ধরে সমস্ত দেখিয়ে আনলে।

কাজের সম্বন্ধে ভিতর দিয়েও মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ—এইটেই বোধ হয় আমাদের পূর্বদেশের জিনিষ। পশ্চিমদেশ কাজকে খুব শক্ত করে খাড়া করে রাখে, সেখানে মানব-সম্বন্ধের দাবী ঘেষতে পারে না। তাতে কাজ খুব পাকা হয় সন্দেহ নেই। আমি ভেবেছিলুম জাপান ত যুরোপের কাছ থেকে কাজের দীক্ষা গ্রহণ করেছে, অতএব তার কাজের গণ্ডিও বোধ হয় পাকা। কিন্তু এই জাপানী জাহাজে কাজ দেখতে পাচ্ছি, কাজের গণ্ডিগুলোকে দেখতে পাচ্চিনে। মনে হচ্ছে যেন আপনার বাড়ীতে আছি—কোম্পানির জাহাজে নেই। অথচ ধোওয়া মাজা প্রভৃতি জাহাজের নিত্যকর্মের কোন খুঁৎ নেই।

প্রাচ্যদেশে মানবসমাজের সম্বন্ধগুলি বিচিত্র এবং গভীর। পূর্বপুরুষ যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও আমাদের সম্বন্ধ ছিল হয় না। আমাদের আত্মীয়তার জাল বহুবিস্তৃত। এই নানা সম্বন্ধের নানা দাবী মেটানো আমাদের চিরাভ্যস্ত, সেই জন্মে তাতে আমাদের আনন্দ। আমাদের ভৃত্যেরাও কেবল বেতনের নয়, আত্মীয়তার দাবী করে। সেই জন্মে যেখানে আমাদের কোনো দাবী চলেনা, যেখানে কাজ অত্যন্ত খাড়া, সেখানে আমাদের প্রকৃতি কষ্ট পায়। অনেক সময়ে ইংরেজ মনিবের সঙ্গে বাঙালী কর্মচারীর যে বোকাপড়ার অভাব ঘটে, তার কারণ এই,—ইংরেজি কর্তা বাঙালী কর্মচারীর দাবী বুঝতে পারে না, বাঙালী কর্মচারী ইংরেজ কর্তার কাজের কড়া শাসন বুঝতে পারে না। কর্মশালার কর্তা যে কেবলমাত্র কর্তা হবে, তা

নয়—মা বাপ হবে, বাঙালী কর্মচারী চিরকালের অভ্যাস বশত এইটে প্রত্যাশা করে ; যখন বাধা পায় তখন আশ্চর্য্য হয়, এবং মনে মনে মনিবকে দোষ না দিবে থাকতে পারে না। ইংরেজ কাজের দাবীকে মানতে অভ্যস্ত, বাঙালী মানুষের দাবীকে মানতে অভ্যস্ত,—এই জন্মে উভয়পক্ষে ঠিকমত মিটমাট হতে চায় না।

কিন্তু কাজের সম্বন্ধ এবং মানুষের সম্বন্ধ, এ দুইয়ের বিচ্ছেদ না হয়ে সামঞ্জস্য হওয়াটাই দরকার, এ কথা না মনে করে থাকা যায় না। কেমন করে সামঞ্জস্য হতে পারে, বাইরে থেকে তার কোনো বাঁধা নিয়ম ঠিক করে দেওয়া যায় না। সত্যকার সামঞ্জস্য প্রকৃতির ভিতর থেকে ঘটে। আমাদের দেশে প্রকৃতির এই ভিতরকার সামঞ্জস্য ঘটে ওঠা কঠিন—কেননা যারা আমাদের কাজের কর্তা, তাঁদের নিয়ম অনুসারেই আমরা কাজ চালাতে বাধ্য।

জাপানে প্রাচ্যমন পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কাজের শিক্ষালাভ করেছে, কিন্তু কাজের কর্তা তারা নিজেই। এই জন্মে মনের ভিতরে একটা আশা হয় যে, জাপানে হয় ত পাশ্চাত্য কাজের সঙ্গে প্রাচ্যজীবের একটা সামঞ্জস্য ঘটে উঠতে পারে। যদি সেটা ঘটে, তবে সেইটেই পূর্ণতার আদর্শ হবে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় অনুকরণের কাজটা যখন কড়া থাকে, তখন বিধিবিধান সম্বন্ধে ছাত্র গুরুর চেয়ে আরো কড়া হয় ; কিন্তু ভিতরকার প্রকৃতি আস্তে আস্তে আগনার কাজ করতে থাকে, এবং শিক্ষার

কড়া অংশগুলোকে নিজের জারক রসে গলিয়ে আপন করে নেয়। এই জর্গ করে নেওয়ার কাজটা একটু সময়সাধ্য। এই জন্মেই পশ্চিমের শিক্ষা জাপানে কি আকার ধারণ করবে, সেটা স্পষ্ট করে দেখবার সময় এখনো হয় নি। সম্ভবত এখন আমরা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বিস্তর অসামঞ্জস্য দেখতে পাব, যেটা কুশী। আমাদের দেশেও পদে পদে তা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির কাজই হচ্ছে অসামঞ্জস্যগুলোকে নিষিদ্ধ দেওয়া। জাপানে সেই কাজ চলছে সন্দেহ নেই। অন্ততঃ জাহাজ টুকুর মধ্যে আমি ত এই দুই ভাবের মিলনের চিহ্নেতে পাচ্ছি।

৯

২রা জ্যৈষ্ঠে আমাদের জাহাজ সিঙাপুরে এসে পৌঁছিল। অনতিকাল পরেই একজন জাপানী যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন; তিনি এখানকার একটি জাপানী কাগজের সম্পাদক। তিনি আমাকে বলেন, তাঁদের জাপানের সব চেয়ে বড় দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাছ থেকে তাঁরা তার পেয়েছেন যে আমি জাপানে যাচ্ছি, সেই সম্পাদক আমার কাছ থেকে একটি বক্তৃতা আদায় করবার জন্মে অনুরোধ করেছেন। আমি বলুম, জাপানে না পৌঁছে আমি এ বিষয়ে আমার সম্মতি জানাতে পারব না। তখনকার মত এই টুকুতেই মিটে গেল। আমাদের

যুবক ইংরেজ বন্ধু পিয়ার্সন এবং মুকুল সহর দেখতে বেরিয়ে গেলেন। জাহাজ একেবারে ঘাটে লেগেচে। এই জাহাজের ঘাটের চেয়ে কুশী বিতীষিকা আর নেই—এরি মধ্যে ঘন মেঘ করে বাদলা দেখা দিলে। বিকট ঘড়ঘড় শব্দে জাহাজ থেকে মাল ওঠানো নাবানো চলতে লাগল। আমি কুঁড়ে মানুষ, কোমর বেঁধে সহর দেখতে বেরনো আশার ধাত্তে নেই। আমি সেই বিষম গোলমালের সাইক্লোনের মধ্যে ডেক-এ বসে মনকে কোনোমতে শান্ত করে রাখবার জন্তে লিখতে বসে গেলুম।

খানিক বাদে কাপ্তেন এসে খবর দিলেন যে, একজন জাপানী মহিলা আগার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি লেখা বন্ধ করে একটি ইংরাজি-বেশ-পরা জাপানী মহিলার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলাম। তিনিও সেই জাপানী সম্পাদকের পক্ষ নিয়ে, বক্তৃতা করবার জন্তে আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। আমি বহু কষ্টে সে অনুরোধ কাটালুম। তখন তিনি বলেন, আপনি যদি একটু সহর বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা করেন ত আপনাকে সব দেখিয়ে আনতে পারি। তখন সেই বস্তা তোলার নিরন্তর শব্দ আমার মনটাকে জাঁতার মত পিচ্ছিল, কোথাও পালাতে পারলে বাঁচি,—সুতরাং আমাকে বেশী পীড়াপীড়ি করতে হল না। সেই মহিলাটির মোটর গাড়িতে করে, সহর ছাড়িয়ে রবার গাছের আবাদের ভিতর দিয়ে, উঁচু নীচু পাহাড়ের পথে অনেকটা দূর ঘুরে এলুম। জমি চেউ-খেলানো, ঘাস ঘন সবুজ, রাস্তার পাশ দিয়ে একটি ঘোলা জলের স্রোত কল্কল করে এঁকে বঁেকে

ছুটে চলেছে, জলের মাঝে মাঝে আঁটিবাঁধা কাটা বেত ভিঙছে।
রাস্তার দুই ধারে সব বাগানবাড়ী। পথে ঘাটে চীনেই বেশী—
এখানকার সকল কাজেই তারা আছে।

গাড়ি সহরের মধ্যে যখন এল, মহিলাটি তাঁর জাপানী
জিনিষের দোকানে আমাকে নিয়ে গেলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে
এসেছে, মনে মনে ভাবছি জাহাজে আমাদের সন্ধ্যাবেলাকার
খাবার সময় হয়ে এল; কিন্তু সেখানে সেই শব্দের ঝড়ে বস্তা
তোলপাড় করতে কল্পনা করে, কোন মতেই ফিরতে মন লাগছিল
না। মহিলাটি একটি ছোট ঘরের মধ্যে বসিয়ে, আমাকে ও
আমার সঙ্গী ইংরাজটিকে খালায় ফল সাজিয়ে খেতে অনুরোধ
করলেন। ফল খাওয়া হলে পর তিনি আস্তে আস্তে অনুরোধ
করলেন, যদি আপত্তি না থাকে তিনি আমাদের হোটеле খাইয়ে
আনতে ইচ্ছা করেন। তাঁর এ অনুরোধও আমরা লঙ্ঘন করি
নি। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তিনি আমাদের জাহাজে পৌঁছিয়ে
দিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন।

এই রমণীর ইতিহাসে কিছু বিশেষত্ব আছে। এঁর স্বামী
জাপানে আইনব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু সে ব্যবসায় যথেষ্ট
লাভজনক ছিল না। তাই আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য হওয়া কঠিন
হয়ে উঠছিল। স্ত্রীই স্বামীকে প্রস্তাব করলেন, এস আমরা
একটা কিছু ব্যবসা করি। স্বামী প্রথমে তাতে নারাজ ছিলেন।
তিনি বলেন, আমাদের বংশে ব্যবসা ত কেউ করে নি, ওটা
আমাদের পক্ষে একটা হীন কাজ। শেষকালে স্ত্রীর অনুরোধে

রাজি হয়ে, জাপান থেকে দুজনে মিলে সিঙাপুরে এসে দোকান খুললেন। সে আজ আঠারো বৎসর হল। আত্মীয়বন্ধু সকলেই একবাক্যে বলে, এইবার এরা মজল। এই স্ত্রীলোকটির পরিশ্রমে, নৈপুণ্যে এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার-কুশলতায়, ক্রমশই ব্যবসায়ের উন্নতি হতে লাগল। গত বৎসরে এঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে—এখন এঁকে একলাই সমস্ত কাজ চালাতে হচ্ছে।

বস্তুত এই ব্যবসাটি এই স্ত্রীলোকেরই নিজের হাতে তৈরি। আমি যে কথা বলছিলাম, এই ব্যবসায়ে তারই প্রমাণ দেখতে পাই। মানুষের মন বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ—এই মেয়েটির মধ্যে আমরাই তার পরিচয় পেয়েছি। তারপরে কর্মকুশলতা মেয়েদের স্বাভাবিক। পুরুষ স্বভাবত কঁড়ে, দায়ে পড়ে তাদের কাজ করতে হয়। মেয়েদের মধ্যে একটা প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে, যার স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে কর্মপরতা। কর্মের সমস্ত খুঁটিনাটি যে কেবল ওরা সহ্য করতে পারে, তা নয়—তাতে ওরা আনন্দ পায়। তা ছাড়া দেনাপাওনা সম্বন্ধে ওরা সাবধানী। এই জন্মে, যে সব কাজে দৈহিক বা মানসিক সাহসিকতার দরকার হয় না, সে সব কাজ মেয়েরা পুরুষের চেয়ে চের ভাল করে করতে পারে, এই আমার বিশ্বাস। স্বামী যেখানে সংসার ছারখার করেছে, সেখানে স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর হাতে সংসার পড়ে সমস্ত সুশৃঙ্খলায় রক্ষা পেয়েছে, আমাদের দেশে তার বিস্তর প্রমাণ আছে;

ওনেহি কালের মেয়েরাও ব্যবসারে আপনাদের কর্মনিপুণতার শক্তি দিয়েচে। যে সব কাজে উদ্ভাবনার দরকার নেই, সে সব কাজে পটুতা, পরিশ্রম, ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সব চেয়ে দরকার, সে সব কাজ মেয়েদের।

৩রা জ্যৈষ্ঠ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়লে। ঠিক এই ছাড়বার সময় একটি বিড়াল জলের মধ্যে পড়ে' গেল। তখন সমস্ত ব্যস্ততা যুচে গিয়ে, ঐ বিড়ালকে বাঁচানই প্রধান কাজ হয়ে উঠল। নানা উপায়ে নানা কৌশলে তাকে জল থেকে উঠিয়ে তবে জাহাজ ছাড়লে। এতে জাহাজ ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল। এইটিতে আমাকে বড় আনন্দ দিয়েচে।

চীন সমুদ্র

তোসা-মারু জাহাজ

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

সমুদ্রের উপর দিয়ে আমাদের দিনগুলি ভেসে চলেচে, পালের নৌকার মত। সে নৌকা কোনো ঘাটে বাবার নৌকা নয়, তাতে কোনো বাঁধাই নেই। কেবলমাত্র চেউয়ের সঙ্গে, বাজারের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি করতে তারা বেরিয়েচে। মানুষের লোকালয় মানুষের বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই লোকালয়ের দাবী মিটিয়ে সময় পাওয়া যায় না, বিশ্বের

নিয়ন্ত্রণ আর রাখতে পারিবে। তাঁর যেমন তার একটা যুগ সূর্যের দিকে ফিরিয়ে রেখেছে, তার আর একটা যুগ অন্ধকার— তেমনি লোকালয়ের প্রচণ্ড টানে মানুষের সেই দিকের পিঠটা-তেই চেতনার সমস্ত আলো খেলচে, অন্য একটা এদিক আমরা ভুলেই গেছি; বিশ্ব যে মানুষের কতখানি, সে আমাদের খেলা-লেই আসে না।

সত্যকে যেদিকে ভুলি, কেবল যে সেই দিকেই লোকসান, তা নয়—সে লোকসান সকল দিকেই। বিশ্বকে মানুষ যে পরিমাণে যতখানি বাদ দিয়ে চলে, তার লোকসানের তাপ এবং কলুষ সেই পরিমাণে ততখানি বেড়ে ওঠে। সেই জন্মেই ক্ষণে ক্ষণে মানুষের একেবারে উন্টোদিকে টান আসে। সে বলে “বৈরাগ্যমেবাত্ময়ং”—বৈরাগ্যের কোনো বালাই নেই। সে বলে বসে, সংসার কারাগার; মুক্তি খুঁজতে শাস্তি খুঁজতে সে বনে, পর্বতে, সমুদ্রতীরে ছুটে যায়। মানুষ সংসারের সঙ্গে বিশ্বের বিচ্ছেদ ঘটিয়েচে বলেই, বড় করে’ প্রাণের নিঃশ্বাস নেবার জন্মে তাকে সংসার ছেড়ে বিশ্বের দিকে যেতে হয়। এত বড় অদ্ভুত কথা তাই মানুষকে বলতে হয়েছে,—মানুষের মুক্তির রাস্তা মানুষের কাছ থেকে দূরে।

লোকালয়ের মধ্যে যখন থাকি, অন্ধকার জিনিষটাকে তখন ডরাই। কেননা লোকালয় জিনিষটা একটা নিরেট জিনিষ; তার মধ্যে কাঁক মাত্রই কাঁক। সেই কাঁকটাকে কোন মতে চাপা দেবার জন্মে আমাদের মন চাই, তাস পাশা চাই, রাজা-উজির

মারা চাই—নইলে সময় কাটে না। অর্থাৎ সময়টাকে আমরা চাইনে, সময়টাকে আমরা বাদ দিতে চাই।

কিন্তু অবকাশ হচ্ছে বিরাটের সিংহাসন। অসীম অবকাশের মধ্যে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ যেখানে আছে, অবকাশ সেখানে ফাঁকা নয়,—একেবারে পরিপূর্ণ। সংসারের মধ্যে যেখানে বৃহৎকে আমরা রাখিনি, সেখানে অবকাশ এমন ফাঁকা; বিশ্বে যেখানে বৃহৎ বিরাজমান, সেখানে অবকাশ এমন গভীরভাবে মনোহর। গায়ে কাপড় না থাকলে মানুষের যেমন লজ্জা সংসারে অবকাশ আমাদের তেমনি লজ্জা দেয়, কেননা, ওটা কিনা শূন্য, তাই ওকে আমরা বলি জড়তা, আলস্য;—কিন্তু সত্যকার সন্ন্যাসীর পক্ষে অবকাশে লজ্জা নেই, কেননা তার অবকাশ পূর্ণতা,—সেখানে উলঙ্গতা নেই।

এ কেমনতর—যেমন প্রবন্ধ এবং গান। প্রবন্ধে কথা যেখানে থামে, সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা। গানে কথা যেখানে থামে, সেখানে সুরে ভরাট। বস্তুত সুর যতই বৃহৎ হয়, ততই কথার অবকাশ বেশী থাকা চাই। গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে, লেখকের সার্থকতা কথার ঝাঁকে!

আমরা লোকালয়ের মানুষ এই যে জাহাজে করে চলছি, এইবার আমরা কিছুদিনের জন্যে বিশ্বের দিকে মুখ ফেরাতে পেরেছি। সৃষ্টির যে-পিঠে অনেকের ঠেলাঠেলি ভিড়, সেদিক থেকে যে-পিঠে একের আসন, সেদিকে এসেছি। দেখতে

পাচ্চি, এই যে নীল আকাশ এবং নীল সমুদ্রের বিপুল অবকাশ
—এ যেন অমৃতের পূর্ণ ঘট।

অমৃত,—সে যে শুভ্র আলোর মত পরিপূর্ণ এক। শুভ্র আলোয় বহুবর্ণচ্ছটা একে মিলেচে, অমৃতরসে তেমনি বহুরস একে নিবিড়। জগতে এই এক আলো যেমন নানাবর্ণে বিচিত্র, সংসারে তেমনি এই এক রসই নানা রসে বিভক্ত। এই জন্মে, অনেককে সত্য করে জানতে হলে, সেই এককে সঙ্গে সঙ্গে জানতে হয়। গাছ থেকে যে ডাল কাটা হয়েছে, সে ডালের ভার মানুষকে বহঁতে হয়, গাছে যে ডাল আছে সে ডাল মানুষের ভার বহঁতে পারে। এক থেকে বিচ্ছিন্ন যে অনেক, তারই ভার মানুষের পক্ষে বোঝা,—একের মধ্যে বিধৃত যে অনেক, সেই ত মানুষকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দিতে পারে।

সংসারে একদিকে আবশ্যকের ভিড়, অন্যদিকে অনাবশ্যকের। আবশ্যকের দায় আমাদের বহন করতেই হবে, তাতে আপত্তি করলে চলবে না। যেমন ঘরে থাকতে হলে দেয়াল না হলে চলে না,—এও তেমনি। কিন্তু সবটাই ত দেয়াল নয়। অস্তিত্ব খানিকটা করে জানালা থাকে—সেই ফাঁক দিয়ে আমরা আকাশের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করি। কিন্তু সংসারে দেখতে পাই লোকে ঐ জানালাটুকু সহঁতে পারে না। ঐ ফাঁকটুকু ভরিয়ে দেবার জন্মে যত্নরকম সাংসারিক অনাবশ্যকের সৃষ্টি। ঐ জানালাটার উপর বাজে কাজ, বাজে চিঠি, বাজে সভা, বাজে বক্তৃতা, বাজে হাঁসফাঁস ঘেরে দিয়ে, দশে মিলে ঐ ফাঁকটাকে

একেবারে বুজিয়ে ফেলা হয়। নারকেলের ছিব্‌ড়ের মত, এই অনাবশ্যকের পরিমাণটাই বেশী। ঘরে, বাইরে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আমোদে, আহ্লাদে, সকল বিষয়েই এরই অধিকার সব চেয়ে বড়—এর কাজই হচ্ছে ফাঁক বুজিয়ে বেড়ানো।

কিন্তু কথা ছিল ফাঁক বোজাব না, কেননা ফাঁকের ভিতর দিয়ে ছাড়া পূর্ণকে পাওয়া যায় না। ফাঁকের ভিতর দিয়েই আলো আসে, হাওয়া আসে। কিন্তু আলো হাওয়া আকাশ যে মানুষের তৈরি জিনিষ নয়, তাই লোকালয় পারংপক্ষে তাদের জন্তে জায়গা রাখতে চায় না—তাই আবশ্যিক বাদে যেটুকু নিরালা থাকে, সেটুকু অনাবশ্যক দিয়ে ঠেসে ভর্তি করে দেয়। এমনি করে মানুষ আপনার দিনগুলোকে ত নিরেট করে তুলেইচে, রাত্রিটাকেও যতখানি পারে ভরাট করে দেয়। ঠিক যেন কলকাতার ম্যুনিসিপালিটির আইন। যেখানে যত পুকুর আছে বুজিয়ে ফেলতে হবে,—রাবিশ দিয়ে হোক, যেমন করে হোক। এমন কি, গঙ্গাকেও যতখানি পারা যায় পুল-চাপা, জেটি-চাপা, জাতাজ-চাপা দিয়ে গলা টিপে মারবার চেষ্টা। ছেলেবেলাকার কল্কাতা মনে পড়ে, ঐ পুকুরগুলোই ছিল আকাশের স্ফাটিক, সহরের মধ্যে ঐখানটাতে দু্যলোক এই ভুলোকে একটুখানি পা ফেলবার জায়গা পেত, ঐখানেই আকাশের আলোকের আতিথ্য করবার জন্ত পৃথিবী আপন জলের আসনগুলি পেতে রেখেছিল।

আবশ্যকের একটা সুবিধা এই যে, তার একটা সীমা আছে। সে সম্পূর্ণ বেতলা হতে পারে না, সে দশটা-চারটেকে স্বীকার

করে, তার পার্বণের ছুটি আছে, সে রবিবারকে মানে, পারংপক্ষে রাত্রিকে সে ইলেকট্রিক লাইট দিয়ে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে চায় না। কেননা, সে যেটুকু সময় নেয়, আয়ু দিয়ে অর্থ দিয়ে তার দাম চুকিয়ে দিতে হয়—সহজে কেউ তার অপব্যয় করতে পারে না। কিন্তু অনাবশ্যকের তালমানের বোধ নেই, সে সময়কে উড়িয়ে দেয়, অসময়কে টিকতে দেয় না। সে সদর রাস্তা দিয়ে ঢোকে, খিড়কির রাস্তা দিয়ে ঢোকে আবার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সে কাজের সময় দরজায় ঘা মারে, ছুটির সময় ছড়মুড় করে আসে, রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তার কাজ নেই বলেই তার ব্যস্ততা আরো বেশী।

আবশ্যক কাজের পরিমাণ আছে, অনাবশ্যক কাজের পরিমাণ নেই—এইজন্যে অপরিমেয়ের আসনটি ঐ লক্ষ্মীছাড়াই জুড়ে বসে, ওকে ঠেলে ওঠানো দায় হয়। তখনই মনে হয় দেশ ছেড়ে পালাই, সন্ন্যাসী হয়ে বেরই, সংসারে আর টেকা যায় না!

যাক্, যেমনি বেরিয়ে পড়েছি, অমনি বুঝতে পেরেছি বিরাট বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে আনন্দের সম্বন্ধ, সেটাকে দিনরাত অস্বীকার করে কোনো বাহাদুরি নেই। এই যে ঠেলাঠেলি ঠেসাঠেসি নেই, অথচ সমস্ত কানায় কানায় ভরা, এইখানকার দর্পণটিতে যেন নিজের মুখের ছায়া দেখতে পেলুম। “আমি আছি” এই কথাটা গলির মধ্যে, ঘরবাড়ীর মধ্যে ভারি ভেঙে চূরে বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। এই কথাটাকে এই সমুদ্রের উপর, আকাশের উপর সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে দেখলে তবে তার মানে

বুঝতে পারি—তখন আবশ্যিককে ছাড়িয়ে, অনাবশ্যিককে পেরিয়ে
আনন্দলোকে তার অত্যর্থনা দেখতে পাই,—তখন স্পর্শ করে
বুঝি, ঋষি কেন মানুষদের অমৃতশ্য পুত্রাঃ বলে আহ্বান করে-
ছিলেন।

সেই খিদিরপুরের ঘাট থেকে আরম্ভ করে আর এই হংকং-
এর ঘাট পর্য্যন্ত, বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের চেহারা দেখে আসছি !
সে যে কি প্রকাণ্ড, এমন করে তাকে চোখে না দেখলে বোঝা
যায় না—শুধু প্রকাণ্ড নয়, সে একটা জবড়জঙ্গ ব্যাপার। কবি-
কঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের আহ্বারের যে বর্ণনা আছে,—সে এক-এক
গ্রাসে এক-এক তাল গিলচে, তার ভোজন উৎকট, তার শব্দ
উৎকট,—এও সেই রকম। এই বাণিজ্যব্যাধটাও হাঁস্ফাঁস
করতে করতে এক-এক পিণ্ড মুখে যা পূরচে, সে দেখে ভয়
হয়—তার বিরাম নেই, আর তার শব্দই বা কি ! লোহার হাত
দিয়ে মুখে তুলচে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্ছে, লোহার পাকযন্ত্রে
চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলে হজম কর্চে, এবং লোহার শিরা উপশিরার
ভিতর দিয়ে তার জগৎজোড়া কলেবরের সর্বত্র সোনার রক্ত-
স্রোত চালান করে দিচ্ছে।

এঁকে দেখে মনে হয় যে এ একটা জন্তু, এ যেন পৃথিবীর
প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলোর মত। কেবলমাত্র তার ল্যাজের

আয়তন দেখলেই শরীর আঁতকে ওঠে ! তারপরে সে জলচর হবে, কি স্থলচর হবে, কি পাখী হবে, এখনো তা স্পষ্ট ঠিক হয় নি,—সে খানিকটা সরীসৃপের মত, খানিকটা বাতুড়ের মত, খানিকটা গণ্ডারের মত । অঙ্গসৌষ্ঠব বলতে যা বোঝায়, তা তার কোথাও কিছুমাত্র নেই । তার গায়ের চামড়া ভয়ঙ্কর স্থূল ; তার খাবা যেখানে পড়ে, সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেরিয়ে পড়ে ; চলবার সময় তার বৃহৎ বিরূপ ল্যাজটা যখন নড়তে থাকে, তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হয়ে এমন আওয়াজ হতে থাকে যে, দিগঙ্গনারা মূর্ছিত হয়ে পড়ে । তারপরে, কেবলমাত্র তার এই বিপুল দেহটা রক্ষা করবার জন্যে এত রাশি রাশি খাদ্য তার দরকার হয় যে, ধরিত্রী ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে । সে যে কেবলমাত্র খাবা খাবা জিনিষ খাচ্ছে তা নয়, সে মানুষ খাচ্ছে,—স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচার করে না ।

কিন্তু জগতের সেই প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলো টিকল না । তাদের অপরিমিত বিপুলতাই পদে পদে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়াতে, বিধাতার আদালতে তাদের প্রাণদণ্ডের বিধান হল । সৌষ্ঠব জিনিষটা কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয় । হাঁস্কাঁস্কাটা যখন অত্যন্ত বেশী চোখে পড়ে, আয়তনটার মধ্যে যখন কেবলমাত্র শক্তি দেখি, শ্রী দেখিনে,—তখন বেশ বুঝতে পারা যায় বিশ্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই ; বিশ্বশক্তির সঙ্গে তার শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ হতে হতে, একদিন

তাকে হার মেনে হাল চেড়ে তলিয়ে যেতে হবেই। প্রকৃতির গৃহীণীপনা কখনই কদর্যা অমিতাচারকে অধিক দিন সহিতে পারে না—তার ঝাঁটা এসে পড়ল বলে! বাণিজ্য-দানবটা নিজের বিরূপতায়, নিজের প্রকাণ্ড ভারের মধ্যে নিজের প্রাণদণ্ড বহন করছে। একদিন আস্তে যখন তার লোহার কঙ্কালগুলোকে আমাদের যুগের স্তরের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করে পুরাতত্ত্ব-বিদ্রা এই সর্ববভুক দানবটার অদ্ভুত বিষমতা নিয়ে বিন্ময় প্রকাশ করবে।

প্রাণীজগতে মানুষের যে যোগ্যতা, সে তার দেহের প্রাচুর্য নিয়ে নয়! মানুষের চামড়া নরম, তার গায়ের জোর অল্প, তার ইন্দ্রিয় শক্তিও পশুদের চেয়ে কম বই বেশী নয়। কিন্তু সে এমন একটি বল পেয়েছে যা চোখে দেখা যায় না, যা জায়গা জোড়ে না, যা কোনো স্থানের উপর ভর না করেও সমস্ত জগতে আপন অধিকার বিস্তার করছে। মানুষের মধ্যে দেহ-পরিধি দৃশ্যজগৎ থেকে সরে গিয়ে অদৃশ্যের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। বাইবেলে আছে, যে নত্ন সেই পৃথিবীকে অধিকার করবে—তার মানেই হচ্ছে নত্নতার শক্তি বাইরে নয়, ভিতরে; সে যত কম আঘাত দেয়, ততই সে জয়ী হয়; সে রণক্ষেত্রে লড়াই করে না; অদৃশ্যলোকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সন্ধি করে সে জয়ী হয়।

বাণিজ্য-দানবকেও একদিন তার দানব-লীলা সম্বরণ করে মানব হতে হবে! আজ এই বাণিজ্যের মস্তিষ্ক কম, ওর হৃদয় ত একেবারেই নেই, সেইজন্যে পৃথিবীতে ও কেবল আপনায়

ভার বাড়িয়ে চলেচে। কেবলমাত্র প্রাণপণ শক্তিতে আপনার
 আয়তনকে বিস্তীর্ণতর করে করেই ও জিত্তে চাচ্ছে। কিন্তু
 একদিন যে জয়ী হবে তার আকার ছোট, তার কর্মপ্রণালী
 সহজ ; মানুষের হৃদয়কে, সৌন্দর্য্যবোধকে, ধর্ম্মবুদ্ধিকে সে মানে ;
 সে নম্র, সে সুশ্রী, সে কর্মর্য্যভাবে লুক্ক নয় ; তার প্রতিষ্ঠা
 অস্তরের সুব্যবস্থায়, বাইরের আয়তনে না ; সে কাউকে বঞ্চিত
 করে বড় নয়, সে সকলের সঙ্গে সন্ধি করে বড়। আজকের
 দিনে পৃথিবীতে মানুষের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে এই বাণিজ্যের
 অনুষ্ঠান সব চেয়ে কুশ্রী, আপন ভারের দ্বারা পৃথিবীকে সে ক্লান্ত
 কর্চে, আপন শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে বধির কর্চে, আপন
 আবর্জনার দ্বারা পৃথিবীকে মলিন কর্চে, আপন লোভের দ্বারা
 পৃথিবীকে আহত কর্চে। এই যে পৃথিবীব্যাপী কুশ্রীতা, এই
 যে বিদ্রোহ,—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এবং মানব-হৃদয়ের
 বিরুদ্ধে,—এই যে লোভকে বিশ্বের রাজসিংহাসনে বসিয়ে তার
 কাছে দাসখত লিখে দেওয়া, এ প্রতিদিনই মানুষের শ্রেষ্ঠ
 মনুষ্যত্বকে আঘাত কর্চেই, তার সন্দেহ নেই। মুনকার নেশায়
 উন্মত্ত হয়ে এই বিশ্বব্যাপী দ্যুতক্রীড়ায় মানুষ নিজেকে পণ রেখে
 কতদিন খেলা চালাবে ? এ খেলা ভাঙতেই হবে। যে খেলায়
 মানুষ লাভ করবার লোভে নিজেকে লোকসান করে চলেচে,
 সে কখনই চলবে না।

৯ই জ্যৈষ্ঠ। মেঘ বৃষ্টি, বাদল কুয়াশায় আকাশ বাপসা
 হয়ে আছে—হংকং বন্দরে পাহাড়গুলো দেখা দিয়েছে তাদের

গা বেয়ে বেয়ে ঝরনা করে পড়েচে। মনে হচ্ছে দৈত্যের দল সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাদের ভিজে মাথা জলের উপর তুলেচে, তাদের জটা বেয়ে দাড়ি বেয়ে জল ঝরচে! এঞ্জু সাহেব বলছেন দৃশ্যটা যেন পাহাড়-ঘেরা স্কটল্যান্ডের ছাদের মত, তেমনি-তর ঘন সবুজ বেঁটে বেঁটে পাহাড়, তেমনিতর ভিজে কয়ালের মত আকাশের মেঘ, তেমনিতর কুয়াসার স্নাতা বুলিয়ে দেয় অল্প মুছে-ফেলা জলস্থলের মূর্তি। কাল সমস্ত রাত বৃষ্টি বাতাস গিয়েচে—কাল বিছানা আমার ভার বহন করে নি, আমিই বিছানাটাকে বহন করে ডেকের এধার থেকে ওধারে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে ফিরেছি। রাত যখন সাড়ে দুপুর হবে, তখন এই বাদলের সঙ্গে মিথ্যা বিরোধ করবার চেষ্টা না করে তাকে প্রসন্ন মনে মনে নেবার জন্মে প্রস্তুত হলাম। একধারে দাঁড়িয়ে ঐ বাদলার সঙ্গে তান মিলিয়েই গান ধরলাম “শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে।” এমনি করে ফিরে ফিরে অনেকগুলো গান গাইলাম,—বানিয়ে বানিয়ে একটা নতুন গানও তৈরি করলাম কিন্তু বাদলের সঙ্গে কবির লড়াইয়ে এই মর্ত্যবাসীকেই হার মানতে হল। আমি অত দম পাব কোথায়, আর আমার কবিত্বের বাতিক যতই প্রবল হোক না, বায়ুবলে আকাশের সঙ্গে পেরে উঠব কেন ?

কাল রাত্রেই জাহাজের বন্দরে পৌঁছবার কথা ছিল, কিন্তু এইখানটায় সমুদ্রবাহী জলের স্রোত প্রবল হয়ে উঠল, এবং বাতাসও বিরুদ্ধ ছিল তাই পদে পদে দেরি হতে লাগল।

জায়গাটাও সঙ্কীর্ণ এবং সঙ্কটময়। কাপ্তেন সমস্ত রাত জাহাজের উপরতলায় গিয়ে সাবধানে পথের হিসাব করে চলেচেন। আজ সকালেও মেঘবৃষ্টির বিরাম নেই। সূর্য্য দেখা দিল না, তাই পথ ঠিক করা কঠিন। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বেজে উঠে, এঞ্জিন খেমে যাচ্ছে, নাবিকের দ্বিধা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। আজ সকালে আটারের টেবিলে কাপ্তেনকে দেখা গেল না। কাল রাত দুপুরের সময় কাপ্তেন একবার কেবল বর্ষাতি পরে নেমে এসে আমাদের বলে গেলেন, ডেকের কোনো দিকেই শোবার সুবিধা হবে না, কেননা বাতাসের বদল হচ্ছে।

এর মধ্যে একটি ব্যাপার দেখে আমার মনে বড় আনন্দ হয়েছিল।—জাহাজের উপর থেকে একটা দড়িরাঁধা চামড়ার চোঙে করে মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তোলা হয়। কাল বিকেলে এক সময়ে মুকুলের হঠাৎ জানতে ইচ্ছা হল, এর কারণটা কি? সে তখন উপরতলায় উঠে গেল। এই উপরতলাতেই জাহাজের হালের চাকা, এবং এখানেই পথনির্ণয়ের সমস্ত যন্ত্র। এখানে যাত্রীদের যাওয়া নিষেধ। মুকুল যখন গেল, তখন তৃতীয় অফিসার কাজে নিযুক্ত। মুকুল তাঁকে প্রশ্ন করতেই, তিনি ওকে বোঝাতে শুরু করলেন। সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি স্রোতের ধারা বইছে, তাদের উত্তাপের পরিমাণ স্বতন্ত্র। মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তুলে তাপমান দিয়ে পরীক্ষা করে সেই ধারাপথ নির্ণয় করা দরকার। সেই ধারার ম্যাপ বের করে তাদের গতিবেগের সঙ্গে জাহাজের গতিবেগের কি

রকম কাটাকাটি হচ্ছে, তাই তিনি মুকুলকে বোঝাতে লাগলেন। তাতেও যখন সুবিধা হল না, তখন বোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব সরল করে দিলেন।

বিলিতি জাহাজে মুকুলের মত বালকের পক্ষে এটা কোনো-মতেই সম্ভবপর হত না। সেখানে ওকে অত্যন্ত সোজা করেই বুঝিয়ে দিত যে, ও জায়গায় তার নিষেধ। মোটের উপরে জাপানী অফিসরের সৌজন্য, কাজের নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এই জাপানী জাহাজে কাজের নিয়মের ফাঁক দিয়ে মানুষের গতিবিধি আছে। অথচ নিয়মটা চাপা পড়ে যায় নি, তাও বারবার দেখেছি। জাহাজ যখন বন্দরে স্থির ছিল, যখন উপরতলার কাজ বন্ধ, তখন সেখানে বসে কাজ করবার জন্যে আমি কাপ্তেনের সম্মতি পেয়েছিলুম। সেদিন পিয়ার্সন সাহেব দুজন ইংরেজ আলাপীকে জাহাজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ডেকের উপর মাল তোলার শব্দে আমাদের প্রস্তাব উঠল, উপরের তলায় যাওয়া বাক। আমি সম্মতির জন্যে প্রধান অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলুম,—তিনি তখন বলেন, “না”। নিয়ে গেলে কাজের ক্ষতি হত না, কেননা কাজ তখন বন্ধ ছিল। কিন্তু নিয়মভঙ্গের একটা সীমা আছে, সে সীমা বন্ধুর পক্ষে যেখানে, অপরিচিতের পক্ষে সেখানে না। উপরের তলা ব্যবহারের সম্মতিতেও আমি যেমন খুসি হয়েছিলুম, তার বাধাতেও তেমনি খুসি হলুম। স্পষ্ট দেখতে পেলুম, এর মধ্যে দক্ষিণ্য আছে, কিন্তু দুর্বলতা নেই।

বন্দরে পৌঁছবামাত্র জাপান থেকে কয়েকখানি অভ্যর্থনার টেলিগ্রাম ও পত্র পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রধান অফিসার এসে আমাকে বলেন, এ যাত্রায় আমাদের সাজ্বাই যাওয়া হল না, একেবারে এখান থেকে জাপান যাওয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন? তিনি বলেন, জাপানবাসীরা আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, তাই আমাদের সদর অফিস থেকে টেলিগ্রামে আদেশ এসেছে, অন্য বন্দরে বিলম্ব না করে চলে যেতে। সাজ্বাইয়ের সমস্ত মাল আমরা এই-খানেই নামিয়ে দেব—অন্য জাহাজে করে সেখানে যাবে।

এই খবরটি আমার পক্ষে যতই গৌরবজনক হোক, এখানে লেখবার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার লেখবার কারণ হচ্ছে এই যে, এই ব্যাপারের একটু বিশেষত্ব আছে, সেটা আলোচ্য। সেটা পুনশ্চ ঐ একই কথা। অর্থাৎ ব্যবসার দাবী সচরাচর যে-পাথরের পাঁচিল খাড়া করে আত্মরক্ষা করে, এখানে তার মধ্যে দিয়েও মানব সম্বন্ধের আনাগোনার পথ আছে। এবং সে পথ কম প্রশস্ত নয়।

জাহাজ এখানে দিন দুয়েক থাকবে। সেই দু'দিনের জন্যে সহরে নেবে হোটেলে থাকবার প্রস্তাব আমার মনে নিলে না। আমার মত কুঁড়ে মানুষের পক্ষে আরামের চেয়ে বিরাম ভাল; আমি বলি, সুখের ল্যাঠা অনেক, সোয়ান্তির বালাই নেই। আমি মাল তোলা-নামার উপদ্রব স্বীকার করেও, জাহাজে রয়ে গেলুম। সে জন্যে আমার যে বক্শিস্ মেলেনি, তা নয়।

প্রথমেই চোখে পড়ল জাহাজের ঘাটে চীনা-মজুরদের কাজ। তাদের একটা করে নীল পায়জামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশমাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলি টেউ খেলাচ্ছে। এরা বড় বড় বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত্ব করচে যে সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাদের তাড়া দেবার কোন দরকার নেই। তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সঙ্গীতের মত বেজে উঠছে। জাহাজের ঘাটে মাল-তোলা-নামার কাজ দেখতে যে আমার এত আনন্দ হবে, একথা আমি পূর্বে মনে করতে পারতুম না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড় সুন্দর; তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর করতে থাকে, এবং সেই শরীরও কাজকে সুন্দর করে তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরীরের ছন্দ আমার সামনে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিলে। এ কথা জোর করে বলতে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোন স্ত্রীলোকের দেহ সুন্দর হতে পারে না,—কেননা শক্তির সঙ্গে সুন্দর এমন নিখুঁৎ সঙ্গতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই দুর্লভ। আমাদের জাহাজের ঠিক সামনেই আর একটা জাহাজে বিকেল বেলায় কাজকর্মের পর সমস্ত চীনা মাল্লা জাহাজের ডেকের উপর

সংগঠিত গান গাইতে গান করছিল—সংগঠিত শরীরের সে কি

স্বর্গীয় শোভা, তা আমি এমন করে আর কোনদিন দেখতে পাই নি।

কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূত ভাবে একত্র দেখতে পেয়ে, আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্ছে। এখানে মানুষ পূর্ণপরিমাণে নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে বহুকাল থেকে প্রস্তুত হচ্ছে। যে-সাধনায় মানুষ আপনাকে আপনি ষোলো-আনা ব্যবহার করবার শক্তি পায়, তার কৃপণতা ঘুচে যায়, নিজেকে নিজে কোন অংশে ফাঁকি দেয় না,—সে যে মস্ত সাধনা। চীন সুদীর্ঘকাল সেই সাধনায় পূর্ণভাবে কাজ করতে শিখেছে, সেই কাজের মধ্যেই তার নিজের শক্তি উদারভাবে আপনার মুক্তি এবং আনন্দ পাচ্ছে;—এ একটি পরিপূর্ণতার ছবি। চীনের এই শক্তি আছে বলেই আমেরিকা চীনকে ভয় করেছে—কাজের উচ্চমে চীনকে সে জিততে পারে না, গায়ের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়।

এই এতবড় একটা শক্তি যখন আপনার আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত্ব হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি আছে? তখন তার কর্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগসাধন হবে। এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে, তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু যে জাতির যে দিকে যতখানি বড় হবার

শক্তি আছে, সে দিকে তাকে ততখানি বড় হয়ে উঠতে দিতে বাধা-দেওয়া যে স্বজাতিপূজা থেকে জন্মেছে, তার মত এমন সর্ববিশেষ পূজা জগতে আর কিছুই নেই। এমন বর্ষর-জাতির কথা শোনা যায়, যারা নিজের দেশের দেবতার কাছে পরদেশের মানুষকে বলি দেয়,—আধুনিক কালের স্বজাতীয়তা তার চেয়ে অনেক বেশী ভয়ানক জিনিস, সে নিজের ক্ষুধার জন্মে এক-একটা জাতিকে-জাতি দেশকে-দেশ দাবী করে।

আমাদের জাহাজের বাঁ পাশে চীনের নৌকার দল। সেই নৌকাগুলিতে স্বামী স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে সকলে মিলে বাস করছে এবং কাজ করছে। কাজের এই ছবিই আমার কাছে সকলের চেয়ে সুন্দর লাগল। কাজের এই মূর্তিই চরম মূর্তি, একদিন এরই জয় হবে। না যদি হয়,—বাণিজ্যদানব যদি মানুষের ঘরকন্যা, স্বাধীনতা সমস্তই গ্রাস করে চলতে থাকে, এবং বৃহৎ এক দাস-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে তোলে তারই সাহায্যে অল্প কয়জনের আরাম এবং স্বার্থ সাধন করতে থাকে, তাহলে পৃথিবী রসাতলে যাবে। এদের মেয়ে পুরুষ ছেলে, সকলে মিলে কাজ করবার এই ছবি দেখে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখতে পাব ? সেখানে মানুষ আপনার বারোআনাকে কাঁকি দিয়ে কাটাচ্ছে। এমন সব নিয়মের জাল, যাতে মানুষ কেবলি বেধে-বেধে গিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়েই নিজের অধিকাংশ শক্তির বাজে খরচ করে এবং

স্টিলতা এবং জড়তার সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।
গরিদিকে কেবলি জাতির সঙ্গে জাতির বিচ্ছেদ, নিয়মের সঙ্গে
কাজের বিরোধ, আচার-ধর্মের সঙ্গে কাল-ধর্মের ঘন্থ।

চীন সমুদ্র

তোসা নারু জাহাজ

১

১২

১৬ জ্যৈষ্ঠ। আজ জাহাজ জাপানের “কোবে” বন্দরে
পৌঁছবে। কয়দিন বৃষ্টিবাদের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে
জাপানের ছোট ছোট দ্বীপ আকাশের দিকে পাহাড় তুলে সমুদ্র
যাত্রীদের ইসারা করচে—কিন্তু বৃষ্টিতে কুয়াশাতে সমস্ত
ঝাপসা ;—বাদলার হাওয়ায় সর্দিকানি হয়ে গলা ভেঙে গেলে
তার আওয়াজ যেরকম হয়ে থাকে, ঐ দ্বীপগুলোর সেইরকম
ঘোরতর সর্দির আওয়াজের চেহারা। বৃষ্টির ছাঁট এবং ভিজ
হাওয়ার তাড়া এড়াবার জন্যে, ডেকের এধার থেকে ওধারে
চোকি টেনে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

আমাদের সঙ্গে যে জাপানী যাত্রী দেশে ফিরছেন, তিনি আজ
ভোরেই তাঁর ক্যাবিন ছেড়ে একবার ডেকের উপর উঠে
এসেছেন, জাপানের প্রথম অভ্যর্থনা গ্রহণ করবার জন্যে। তখন
কেবল একটি মাত্র ছোট নীলাভ পাহাড় মানসসরোবরের মত
একটি নীল পদ্মের কুঁড়ির মত জলের উপরে জেগে রয়েছে।
তিনি স্থির নেত্রে এইটুকু কেবল দেখে নীচে নেবে গেলেন,

তঁার সেই চোখে ঐ পাহাড় টুকুকে দেখা আমাদের শক্তিতে নেই—আমরা দেখছি নূতনকে, তিনি দেখছেন তাঁর চিরন্তনকে ; আমরা অনেক তুচ্ছকে বাদ দিয়ে দিয়ে দেখছি, তিনি ছোট বড় সমস্তকেই তাঁর এক বিরাটের অঙ্গ করে দেখছেন,—এই জন্মেই ছোটও তাঁর কাছে বড়, ভাঙাও তাঁর কাছে জোড়া ; অনেক তাঁর কাছে এক । এই দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি ।

জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে এসে পৌঁছিল, তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঠেছে । বড় বড় জাপানী অঙ্গরা নৌকা, আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে, যেখানে বরুণদেবের সভাপ্রাঙ্গণে সূর্য্যদেবের নিমন্ত্রণ হয়েছে, সেইখানে নৃত্য করছে । প্রকৃতির নাট্যক্ষেত্রে বাদলার যবনিকা উঠে গিয়েছে,—ভাবলুম এইবার ডেকের উপরে রাজার হালে বসে, সমুদ্রের তীরে জাপানের প্রথম প্রবেশটা ভাল করে দেখে নিই ।

কিন্তু সে কি হবার জো আছে ? নিজের নামের উপমা গ্রহণ করতে যদি কোনো অপরাধ না থাকে, তাহলে বলি আমার আকাশের মিতা যখন খালাস পেয়েছেন, তখন আমার পালার আরম্ভ হল । আমার চারিদিকে একটু কোথাও ফাঁক দেখতে পেলুম না । খবরের কাগজের চর তাদের প্রশ্ন এবং তাদের ক্যামেরা নিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে ।

কোবে সহরে অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় বণিক আছেন, তার মধ্যে বাঙালীর ছিটেফোঁটাও কিছু পাওয়া যায় । আমি হংকং সহরে পৌঁছেই এই ভারতবাসীদের টেলিগ্রাম - পেরেছিলুম,

তঁরাই আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা জাহাজে গিয়ে আমাকে ধরলেন। ওদিকে জাপানের বিখ্যাত চিত্রকর টাইকন এসে উপস্থিত। ইনি যখন ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। কাটস্টাকেও দেখা গেল, ইনিও আমাদের চিত্রকর বন্ধু। সেই সঙ্গে সানো এসে উপস্থিত,— ইনি এককালে আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে জুজুৎসু ব্যায়ামের শিক্ষক ছিলেন। এর মধ্যে কাওয়াগুচিরও দর্শন পাওয়া গেল। এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আমাদের নিজের ভাবনা আর ভাবতে হবে না। কিন্তু দেখতে পেলুম সেই ভাবনার ভার অনেকে মিলে যখন গ্রহণ করেন, তখন ভাবনার অন্ত থাকে না। আমাদের প্রয়োজন অল্প, কিন্তু আয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী হয়ে উঠল। জাপানী পক্ষ থেকে তাঁদের ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে টানাটানি করতে লাগলেন—কিন্তু ভারতবাসীর আমন্ত্রণ আমি পূর্বেই গ্রহণ করেছি। এই নিয়ে বিষম একটা সঙ্কট উপস্থিত হল। কোনো পক্ষই হার মানতে চান না। বাদ বিতণ্ডা বচসা চলতে লাগল। আবার এরই সঙ্গে সঙ্গে সেই খবরের কাগজের চরের দল আমার চারিদিকে পাক-খেয়ে বেড়াতে লাগল। দেশ ছাড়বার মুখে বঙ্গসাগরে পেয়েছিলুম বাতাসের সাইক্লোন, এখানে জাপানের ঘাটে এসে পৌঁছেই পেলুম মানুষের সাইক্লোন! ছুটোর মধ্যে যদি বাচাই করতেই হয়, আমি প্রথমটাই পছন্দ করি। খ্যাতি জিনিষের বিপদ এই যে, তার মধ্যে যতটুকু আমার

দরকার কেবলমাত্র সেইটুকু গ্রহণ করেই নিষ্কৃতি নেই, তার চেয়ে অনেক বেশী নিতে হয়; সেই বেশীটুকুর বোঝা বিষয় বোঝা। অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির মধ্যে কোনটা যে কসলের পক্ষে বেশী মুকিল জানিনে।

এখানকার একজন প্রধান গুজরাটি বণিক মোরারজি— তাঁরই বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছি। সেই সব খবরের কাগজের অনুচররা এখানে এসেও উপস্থিত।

এই উৎপাতটা আশা করিনি। জাপান যে নতুন মদ পান করেছে, এই খবরের কাগজের ফেনিলতা তাঁরই একটা অঙ্গ। এত কেনা আমেরিকাতেও দেখি নি। এই জিনিষটা কেবলমাত্র কথার হাওয়ার বুদুদপুঞ্জ;—এতে কারো সত্যকার প্রয়োজনও দেখি নে, আমোদও বুঝিনে;—এতে কেবলমাত্র পাত্রটার মাথা শূন্যতার ভর্তি করে দেয়, মাদকতার ছবিটাকে কেবল চোখের সামনে প্রকাশ করে। এই মাংলামিটাই আমাকে সব চেয়ে পীড়া দেয়। বাক্গে।

মোরারজির বাড়ীতে আহারে আলাপে অত্যর্থনার কাল রাত্তিরটা কেটেচে। এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করে সব চেয়ে চোখে পড়ে জাপানী দাসী! মাথায় একখানা ফুলে-ওঠা খোঁপা, গাল দুটো ফুলো ফুলো, চোখ দুটো ছোট, নাকের একটুখানি অপ্রতুলতা, কাপড় বেশ সুন্দর, পায়ে খড়ের চটি; কবিরী সৌন্দর্যের বেরকম বর্ণনা করে থাকেন, তার সঙ্গে অনৈক্য চের; অথচ মোটের উপর দেখতে ভাল লাগে; যেন

মানুষের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে মোমের সঙ্গে মিশিয়ে
 একটা পদার্থ; আর সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্ততা, নৈপুণ্য, বলিষ্ঠতা।
 গৃহস্বামী বলেন, এরা যেমন কাজের, তেমনি এরা পরিষ্কার
 পরিচ্ছন্ন। আমি আমার অভ্যাস বশত ভোরে উঠে জানালার
 বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়ীতে ঘরকন্নার হিম্মোল
 তখন জাগ্রুতে আরম্ভ করেছে—সেই হিম্মোল মেয়েদের হিম্মোল।
 ঘরে ঘরে এই মেয়েদের কাজের ঢেউ এমন বিচিত্র বৃহৎ এবং
 প্রবল করে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা
 দেখলেই বোঝা যায় এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। দেহ-
 যাত্রা জিনিসটার ভার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মেয়েদেরই
 হাতে,—এই দেহযাত্রার আয়োজন উত্তোগ মেয়েদের গন্ধে
 স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কাজের এই নিয়ত তৎপরতার
 মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় বলে শ্রীলাভ করে। বিলা-
 সের জড়তার কিছা যে কারণেই হোক, মেয়েরা যেখানে এই
 কর্মপরতা থেকে বঞ্চিত সেখানে তাদের বিকার উপস্থিত
 হয়, তাদের দেহমনের সৌন্দর্য হানি হতে থাকে, এবং তাদের
 যথার্থ আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। এই যে এখানে সমস্তক্ষেপ ঘরে
 ঘরে ক্ষিপ্তবেগে মেয়েদের হাতের কাজের স্রোত অবিরত বইছে,
 এ আমার দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। মাঝে মাঝে পাশের
 ঘর থেকে এদের গলার আওয়াজ এবং হাসির শব্দ শুন্তে
 পাচ্ছি, আর মনে মনে ভাবছি মেয়েদের কথা ও হাসি সকল
 দেশেই সমান। অর্থাৎ সে যেন স্রোতের জলের উপরকার

আলোর মত একটা বিকিমিকি ব্যাপার, জীবন-চাক্ষুস্যের
অহেতুক লীলা।

কোবে

১৩

নতুনকে দেখতে হলে, মনকে একটু বিশেষ করে বাস্তি
জ্বালাতে হয়। পুরোগোকে দেখতে হলে, ভাল করে চোখ
মেলতেই হয় না। সেই জন্মে নতুনকে যত শীঘ্র পারে দেখে
নিয়ে, মন আপনার অতিরিক্ত বাস্তিগুলো নিবিয়ে ফেলে।
খরচ বাঁচাতে চায়, মনোযোগকে উস্কে রাখতে চায় না।

মুকুল আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল,—দেশে থাকতে বই পড়ে,
ছবি দেখে জাপানকে যেরকম বিশেষভাবে নতুন বলে মনে হত,
এখানে কেন তা হচ্ছে না?—তার কারণই এই। রেঙ্গুন থেকে
আরম্ভ করে, সিঙাপুর, হংকং দিয়ে আসতে আসতে মনের নতুন
দেখার বিশেষ আয়োজনটুকু ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে আসে। যখন
বিদেশী সমুদ্রের এ-কোণে ও-কোণে গ্যাড়া গ্যাড়া পাহাড়গুলো
উঁকি মারতে থাকে, তখন বলতে থাকি, বাঃ! তখন মুকুল
বলে, এখানে নেবে গিয়ে থাকতে বেশ মজা! ও মনে করে
এই নতুনকে প্রথম দেখার উদ্বেজনা বুঝি চিরদিনই থাকবে;
ওখানে ঐ ছোট ছোট পাহাড়গুলোর সঙ্গে গলা-ধরাধরি করে
সমুদ্র বুঝি চিরদিনই এই নতুন ভাষায় কানাকানি করে; যেন

ঐখানে পৌঁছলে পরে সমুদ্রের চঞ্চলনীল, আকাশের শান্তনীল আর ঐ পাহাড়গুলোর ঝাপসামীল ছাড়া আর কিছুই দরকারই হয় না। তার পরে বিরল ক্রমে অবিরল হতে লাগল, ক্ষণে ক্ষণে আমাদের জাহাজ এক-একটা দ্বীপের গা ঘেঁষে চলল; তখন দেখি দূরবীন টেবিলের উপরে অনাদরে পড়ে থাকে, মন আর সাড়া দেয় না। যখন দেখবার সামগ্রী বেড়ে ওঠে, তখন দেখাটাই কমে যায়। নতুনকে ভোগ করে নতুনের ক্ষিদে ক্রমে কমে যায়।

হুপ্তাখানেক জাপানে আছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন আছি। তার মানে, পথঘাট, গাছপালা, লোকজনের যেটুকু নতুন, সেটুকু তেমন গভীর নয়,—তাদের মধ্যে যেটা পুরোগো সেইটেই পরিমাণে বেশী। অফুরান নতুন কোথাও নেই; অর্থাৎ যার সঙ্গে আমাদের চিরপরিচিত খাপ খায় না, জগতে এমন অসঙ্গত কিছুই নেই। প্রথমে ধাঁ করে চোখে পড়ে, যেগুলো হঠাৎ আমাদের মনের অভ্যাসের সঙ্গে মেলে না।—তারপরে পুরোগোর সঙ্গে নতুনের যে যে অংশের রঙে মেলে, চেহারায় কাছাকাছি আসে, মন তাড়াতাড়ি সেইগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। তাস খেলতে বসে আমরা হাতে কাগজ পেলের রং এবং মূল্য-অনুসারে তাদের পরে পরে সাজিয়ে নিই,—এও সেই রকম। শুধু ত নতুনকে দেখে যাওয়া নয়, তার সঙ্গে যে ব্যবহার করতে হবে; কাজেই মন তাকে নিজের পুরোগো কাঠামোর মধ্যে যত শীঘ্র পারে গুছিয়ে নেয়। যেই গোছানো হয়, তখন দেখতে

পাই, তত বেশী নতুন নয়, যতটা গোড়ায় মনে হয়েছিল ; আসলে পুরোনো, ভগ্নীটাই নতুন ।

তারপরে আর এক মুকিল হয়েছে এই যে, দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর সকল সভ্য জাতই বর্তমান কালের ছাঁচে ঢালাই হয়ে একই রকম চেহারা অথবা চেহারার অভাব ধারণ করেছে । আমার এই জানলায় বসে কোবে সহরের দিকে তাকিয়ে, এই যা দেখছি, এ ত লোহার জাপান,—এ ত রক্তমাংসের নয় । একদিকে আমার জানলা, আর-একদিকে সমুদ্র, এর মাঝখানে সহর । চীনেরা যেরকম বিকটমূর্ত্তি ড্র্যাগন অঁাকে—সেইরকম অঁাকাঁাকা বিপুল দেহ নিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটিকে খেয়ে ফেলেচে । গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি লোহার চালগুলো ঠিক যেন তারি পিঠের অঁাসের মত রৌদ্রে ঝকঝক কর্চে । বড় কঠিন, বড় কুৎসিত,—এই দরকার নামক দৈত্যটা । প্রকৃতির মধ্যে মানুষের যে অন্ন আছে, তা ফলে-শস্ত্রে বিচিত্র এবং সুন্দর ; কিন্তু সেই অন্নকে যখন গ্রাস করতে যাই, তখন তাকে ভাল পাকিয়ে একটা পিণ্ড করে তুলি ; তখন বিশেষত্বকে দরকারের চাপে পিষে ফেলি । কোবে সহরের পিঠের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, মানুষের দরকার পদার্থটা স্বভাবের বিচিত্রতাকে একাকার করে দিয়েচে । মানুষের দরকার আছে, এই কথাটাই ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে, হাঁ করতে করতে পৃথিবীর অধিকাংশ-কে গ্রাস করে ফেল্চে । প্রকৃতিও কেবল দরকারের সামগ্রী, মানুষও কেবল দরকারের মানুষ হয়ে আস্চে ।

যে দিন থেকে কল্কাতা ছেড়ে বেরিয়েছি, ঘাটে ঘাটে দেশে দেশে এইটেই খুব বড় করে দেখতে পাচ্ছি। মানুষের দরকার মানুষের পূর্ণতাকে যে কতখানি ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এর আগে কোন দিন আমি সেটা এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাই নি। এক সময়ে মানুষ এই দরকারকে ছোট করে দেখেছিল। ব্যবসাকে তারা নীচের জায়গা দিয়েছিল; টাকা রোজগার করাটাকে সম্মান করে নি। 'দেবপূজা করে', 'বিদ্যাদান করে', 'আনন্দ দান করে' যারা টাকা নিয়েছে, মানুষ তাদের ঘৃণা করেছে। কিন্তু আজ-কাল জীবনযাত্রা এতই বেশী দুঃসাধ্য, এবং টাকার আয়তন ও শক্তি এতই বেশী বড় হয়ে উঠেছে যে, দরকার এবং দরকারের বাহনগুলোকে মানুষ আর ঘৃণা করতে সাহস করে না। এখন মানুষ আপনার সকল জিনিসেরই মূল্যের পরিমাণ, টাকা দিয়ে বিচার করতে লজ্জা করে না। এতে করে সমস্ত মানুষের প্রকৃতি বদল হয়ে আসছে—জীবনের লক্ষ্য এবং গৌরব, অন্তর থেকে বাইরের দিকে, আনন্দ থেকে প্রয়োজনের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে পড়ছে। মানুষ ক্রমাগত নিজেকে বিক্রি করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করছে না। ক্রমশই সমাজের এমন একটা বদল হয়ে আসছে টাকাই যে, মানুষের যোগ্যতারূপে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ এটা কেবল দায়ে পড়ে ঘটছে, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। তাই এক সময়ে যে-মানুষ মনুষ্যত্বের খাতিরে টাকাকে অবজ্ঞা করতে জানত, এখন সে টাকার খাতিরে মনুষ্যত্বকে অবজ্ঞা করছে। রাজ্যতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, ঘরে বাইরে, সর্বত্রই তার

পরিচয় কুৎসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বীভৎসতাকে দেখতে পাচ্চি
নে, কেননা লোভে দুই চোখ আচ্ছন্ন।

জাপানে সহরের চেহারায় জাপানিহ বিশেষ নেই, মানুষের
সাজ সজ্জা থেকেও জাপান ক্রমশঃ বিদায় নিচ্ছে। অর্থাৎ,
জাপান ঘরের পোষাক ছেড়ে আপিসের পোষাক ধরেছে। আজ-
কাল পৃথিবী-জোড়া একটা আপিস-রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়েছে। সেটা
কোনো বিশেষ দেশ নয়। যেহেতু আপিসের সৃষ্টি আধুনিক
যুরোপ থেকে, সেই জন্মে এর বেশ আধুনিক যুরোপের। কিন্তু
প্রকৃতপক্ষে এই বেশে মানুষের বা দেশের পরিচয় দেয় না,
আপিস-রাজ্যের পরিচয় দেয়। আমাদের দেশেও ডাক্তার
বল্চে,—আমার ঐ ছাট্ কোটের দরকার আছে; আইনজীবীও
তাই বল্চে, বণিকও তাই বল্চে। এমনি করেই দরকার জিনিষ-
টা বেড়ে চলতে চলতে, সমস্ত পৃথিবীকে কুৎসিতভাবে একাকার
করে দিচ্ছে।

এইজন্মে জাপানের সহরের রাস্তায় বেরলেই, প্রধানভা
চোখে পড়ে জাপানের মেয়েরা। তখন বুঝতে পারি, এই
জাপানের ঘর, জাপানের দেশ। এরা আপিসের নয়। কারো
কারো কাছে শুনতে পাই, জাপানের মেয়েরা এখানকার
পুরুষের কাছ থেকে সম্মান পায় না। সে কথা সত্য কি মিথ্যা
জানিনে, কিন্তু একটা সম্মান আছে সেটা বাইরে থেকে দেওয়া
নয়—সেটা নিজের ভিতরকার। এখানকার মেয়েরাই জাপানের
বেশে জাপানের সম্মানরক্ষার ভার নিয়েছে। ওরা দরকারকেই

সকলের চেয়ে বড় করে খাতির করেনি, সেই জন্মেই ওরা নয়নমনের আনন্দ।

একটা জিনিষ এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা যেন চোঁচাতে জানে না, লোকে বলে জাপানের ছেলেরা হুক কাঁদে না। আমি এপর্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখিনি। পথে মোটরে করে যাবার সময়ে, মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে,—গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিক্ল মোটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম করলে—আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিক্ল-আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাকতে পারত না। এ লোকটা ক্রফেপ মাত্র করলে না। এখানকার বাঙালীদের কাছে শুনতে পেলুম যে, রাস্তায় দুই বাইসিক্লে, কিম্বা গাড়ির সঙ্গে বাইসিক্লের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনো উভয় পক্ষ চোঁচামেচি গালমন্দ না করে, গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানী বাজে চোঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীর মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা, ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে

ছুখে, আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে। সেই জন্মেই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে—জাপানীকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশী গুঢ়। এর কারণই হচ্ছে, এরা নিজেকে সর্বদা ফুটো দিয়ে, কাঁক দিয়ে গলে পড়তে দেয় না।

এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা,— এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। সেই জন্মেই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্ছে, এ আমি শুনি নি। এদের হৃদয় ঝরনার জলের মত শব্দ করে না, সরোবরের জলের মত স্তব্ধ। এ পর্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেছি সবগুলিই হচ্ছে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ কোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্য্য-বোধে। সৌন্দর্য্য-বোধ জিনিসটা স্বার্থমিরপেক্ষ। ফুল, পাখী, চাঁদ, এদের নিয়ে আমাদের কাঁদাকাটা নেই। এদের সঙ্গে আমাদের নিছক সৌন্দর্য্যভোগের সম্বন্ধ—এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছু কাড়ে না—এদের দ্বারা আমাদের জীবনে কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেই জন্মেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাটাতেও এরা শাস্তির ব্যাঘাত করে না।

এদের দুটো বিখ্যাত পুরোণো কবিতার নমুনা দেখলে

পুরোগো পুকুর,

ব্যাঙের লাফ,

জলের শব্দ ।

বাস্! আর দরকার নেই। জাপানী পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোগো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল—এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কিরকম স্তব্ধ। এই পুরোগো পুকুরের ছবিটা কি ভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইসারা করে দিলে—তার বেশী একেবারে অনাবশ্যিক।

আর একটা কবিতা :—

পচা ডাল,

একটা কাক,

শরৎ কাল।

আর বেশী না! শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, ছুই একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক বসে। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্ছে গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশায় আকাশ স্নান হবার কাল—এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক বসে আছে, এই-টুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও স্নানতার ছবি মনের সামনে দেখতে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত করে দিয়েই সরে দাঁড়ায়। তাকে যে অত অল্পের মধ্যেই সরে বেতে হয়,

তার কারণ এই যে, জাপানি পাঠকের চেহারা দেখার মানসিক শক্তিটা প্রবল।

এইখানে একটা কবিতার নমুনা দিই, যেটা চোখে দেখার চেয়ে বড় :—

স্বর্গ এবং মর্ত্য হচ্ছে ফুল, দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল—
মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা।

আমার মনে হয়, এই কবিতাটিতে জাপানের সঙ্গে ভারত-বর্ষের মিল হয়েছে। জাপান স্বর্গমর্ত্যকে বিকশিত ফুলের মত সুন্দর করে দেখে—ভারতবর্ষ বলতে, এই যে একবৃন্তে দুই ফুল,—স্বর্গ এবং মর্ত্য, দেবতা এবং বুদ্ধ,—মানুষের হৃদয় যদি না থাকত, তবে এ ফুল কেবলমাত্র বাইরের জিনিস হত ;—এই সুন্দরের সৌন্দর্য্যটিই হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।

যাই হোক, এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্যসংযম তা নয়—এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযম হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও স্কন্ধ করছে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বলতে গেলে, একে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।

মানুষের একটা ইন্দ্রিয়শক্তিকে খর্ব্ব করে আর-একটাকে বাড়ানো চলে, এ আমরা দেখেছি। সৌন্দর্য্যবোধ এবং হৃদয়-বেগ, এ দুটোই হৃদয়বৃত্তি। আবেগের বোধ এবং প্রকাশকে খর্ব্ব করে, সৌন্দর্য্যের বোধ এবং প্রকাশকে প্রভূত পরিমাণে

বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে,—এখানে এসে অবধি এই কথাটা আমার মনে হয়েছে। হৃদয়োচ্ছ্বাস আমাদের দেশে এবং অন্ত্র বিস্তর দেখেছি, সেইটে এখানে চোখে পড়ে না। সৌন্দর্যের অনুভূতি এখানে এত বেশী করে' এবং এমন সর্বত্র দেখতে পাই যে, স্পর্শই বুঝতে পারি যে, এটা এমন একটা বিশেষ বোধ যা আমরা ঠিক বুঝতে পারি নে। এ যেন কুকুরের আশঙ্কিত ও মৌমাছির দিক্-বোধের মত, আমাদের উপলব্ধির অতীত। এখানে যে লোক অত্যন্ত গরীব, সেও প্রতিদিন নিজের পেটের ক্ষুধাকে বঞ্চনা করেও এক আধ পয়সার ফুল না কিনে বাঁচে না। এদের চোখের ক্ষুধা এদের পেটের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়।

কাল দুজন জাপানী মেয়ে এসে, আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা, কত নৈপুণ্য আছে, তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সঙ্গীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে স্ফূরণের, কাল আমি ঐ দুজন জাপানী মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পারছিলাম।

একটা বইয়ে পড়ছিলাম, প্রাচীন কালে বিখ্যাত যোদ্ধা য়ারা ছিলেন, তাঁরা অবকাশকালে এই ফুল সাজানোর বিদ্যার আলোচনা করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এতে তাঁদের বগদক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতি হয়। এর থেকেই বুঝতে পারবে, জাপানী নিজের

এই সৌন্দর্য্য-অনুভূতিকে সৌধীন জিনিষ বলে মনে করে না ; ওরা জানে গভীরভাবে এতে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয় । এই শক্তিবৃদ্ধির মূল কারণটা হচ্ছে শাস্তি ; যে সৌন্দর্য্যের আনন্দ নিরাসক্ত আনন্দ, তাতে জীবনের ক্ষয় নিবারণ করে, এবং যে উত্তেজনাপ্রবণতায় মানুষের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে, এই সৌন্দর্য্যবোধ তাকে পরিশ্রান্ত করে ।

সেদিন একজন ধনী জাপানী তাঁর বাড়িতে চা-পান অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন । তোমরা ওকাকুরার Book of Tea পড়েচ, তাতে এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে । সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, জাপানীর পক্ষে এটা ধর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্য । এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা । ওরা কোন্ আইডিয়ালকে লক্ষ্য করচে, এর থেকে তা বেশ বোঝা যায় ।

কোবে থেকে দীর্ঘ পথ মোটর যানে করে গিয়ে, প্রথমেই একটি বাগানে প্রবেশ করলুম—সে বাগান ছায়াতে, সৌন্দর্য্যে এবং শাস্তিতে একেবারে নিবিড়ভাবে পূর্ণ । বাগান জিনিষটী যে কি, তা এরা জানে । কতকগুলো কাঁকর ফেলে আর গাছ পুঁতে, মাটির উপরে জিয়োমেট্রি কষাকেই যে বাগান করা বলে না, তা জাপানী-বাগানে ঢুকলেই বোঝা যায় । জাপানীর চোখ এবং হাত দুইই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্য্যের দীক্ষালাভ করেছে,—যেমন ওরা দেখতে জানে, তেমনি ওরা গড়তে জানে । ছায়াপথ দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় গাছের তলায় গর্ত-করা

একটা পাথরের মধ্যে স্বচ্ছ জল আছে, সেই জলে আমরা প্রত্যেকে হাত মুখ ধুই। তারপরে একটা ছোট ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চির উপরে ছোট ছোট গোল গোল খড়ের আসন পেতে দিলে, তার উপরে আমরা বসলাম। নিয়ম হচ্ছে এইখানে কিছুকাল নীরব হয়ে বসে থাকতে হয়। গৃহস্বামীর সঙ্গে যাবামাত্রই দেখা হয় না। মনকে শান্ত করে স্থির করবার জন্যে, ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। আস্তে আস্তে দুটো তিনটে ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করতে করতে, শেষে আসল জায়গায় যাওয়া গেল। সমস্ত ঘরই নিস্তরক, যেন চিরপ্রদোষের ছায়াবৃত—কারো মুখে কথা নেই। মনের উপর এই ছায়াঘন নিঃশব্দ নিস্তরকতার সম্মোহন ঘনিয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে গৃহস্বামী এসে নমস্কারের দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

ঘরগুলিতে আসবাব নেই বলেই হয়, অথচ মনে হয় যেন এ সমস্ত ঘর কি-একটাতে পূর্ণ, গম্গম্ করছে। একটিমাত্র ছবি কিম্বা একটিমাত্র পাত্র কোথাও আছে। নিমন্ত্রিতেরা সেইটি বহুযত্নে দেখে দেখে নীরবে তৃপ্তিলাভ করেন। যে জিনিষ যথার্থ সুন্দর, তার চারিদিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভালো জিনিষগুলিকে ঘেঁসাঘেঁসি করে রাখা তাদের অপমান করা—সে যেন সতী স্ত্রীকে সতীনের ঘর করতে দেওয়ার মত। ক্রমে ক্রমে অপেক্ষা করে করে, স্তরস্তর ও নিঃশব্দতার দ্বারা মনের ক্ষুধাকে জাগ্রত করে তুলে, তার

পরে এইরকম দুটি একটি ভালো জিনিষ দেখালে, সে যে কি উদ্ভল হয়ে ওঠে, এখানে এসে তা স্পর্শ করতে পারলুম। আমার মনে পড়ল, শাস্তিনিকেতন আশ্রমে যখন আমি এক-এক-দিন এক-একটি গান তৈরি করে সকলকে শোনাতুম, তখন সকলেরই কাছে সেই গান তার হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে দিত। অথচ সেই সব গানকেই তোড়া বেঁধে কল্কাতায় এনে যখন বাস্কব-সভায় ধরেছি, তখন তারা আপনার যথার্থ শ্রীকে আবৃত্ত করে রেখেছে। তার মানেই কল্কাতার বাড়ীতে গানের চারিদিকে ফাঁকা নেই—সমস্ত লোকজন ঘরবাড়ী, কাজকর্ম, গোলমাল, তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছে। যে আকাশের মধ্যে তার ঠিক অর্থটি বোঝা যায়, সেই আকাশ নেই।

তারপরে গৃহস্বামী এসে বলেন,—চা তৈরি করা এবং পরিবেষণের তার বিশেষ কারণে তিনি তাঁর মেয়ের উপরে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে এসে, নমস্কার করে, চা তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে, চা তৈরিতে প্রত্যেক অঙ্গ যেন ছন্দের মত। ধোওয়া মোছা, আগুন-জ্বালা, চা-দানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংঘম এবং সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত যে, সে না দেখলে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আস্বাবটি দুর্লভ ও সুন্দর। অতিথির কর্তব্য হচ্ছে, এই পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একান্ত মনোযোগ

দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র নাম এবং ইতিহাস।
কত যে তার বস্তু, সে বলা যায় না।

সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীরকে মনকে একান্ত সংযত করে, নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্য্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর ভোগোন্মাদ নয়—কোথাও লেশমাত্র উচ্ছ্বলতা বা অমিতাচার নেই ;—মনের উপর-তলায় সর্বদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে, নানা প্রয়োজনের হাওয়ায়, কেবলি ঢেউ উঠচে,—তার থেকে দূরে, সৌন্দর্য্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করে দেওয়াই হচ্ছে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য।

এর থেকে বোঝা যায়, জাপানের যে সৌন্দর্য্যবোধ, সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি। বিলাস জিনিষটা অস্তুরে বাহিরে কেবল খরচ করায়, তাতেই দুর্বল করে। কিন্তু বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের মনকে স্বার্থ এবং বস্তুর সংঘাত থেকে রক্ষা করে। সেই জন্মেই জাপানীর মনে এই সৌন্দর্য্যবোধ পৌরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেচে।

এই উপলক্ষ্যে আর একটি কথা বলাবার আছে। এখানে মেয়ে পুরুষের সামীপ্যের মধ্যে কোনো গ্লানি দেখতে পাইনে। অল্পত্ন মেয়েপুরুষের মাঝখানে যে একটা লজ্জা সঙ্কোচের আবিলতা আছে, এখানে তা নেই। মনে হয় এদের মধ্যে মোহের একটা আবরণ যেন কম। তার প্রধান কারণ, জাপানে

স্ত্রী-পুরুষের একত্র বিবস্ত্র হয়ে স্নান করার প্রথা আছে। এই প্রথার মধ্যে যে লেশমাত্র কলুষ নেই, তার প্রমাণ এই—নিকটতম আত্মীয়েরাও এতে মনে কোনো বাধা অনুভব করে না। এমনি করে, এখানে স্ত্রীপুরুষের দেহ, পরস্পরের দৃষ্টিতে কোনো মায়াকে পালন করে না। দেহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মন খুব স্বাভাবিক। অন্য দেশের কলুষদৃষ্টি ও দুষ্টিবুদ্ধির খাতির আজকাল সহরে এই নিয়ম উঠে যাচ্ছে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এখনো এই নিয়ম চলিত আছে। পৃথিবীতে যত সভ্য দেশ আছে, তার মধ্যে কেবল জাপান মানুষের দেহ সম্বন্ধে যে মোহমুক্ত,—এটা আমার কাছে খুব একটা বড় জিনিষ বলে মনে হয়।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে, জাপানের ছবিতে উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তি কোথাও দেখা যায় না। উলঙ্গতার গোপনীয়তা ওদের মনে রহস্যজাল বিস্তার করে নি বলেই এটা সম্ভবপর হয়েছে। আরো একটা জিনিষ দেখতে পাই। এখানে মেয়েদের কাপড়ের মধ্যে নিজেকে স্ত্রীলোক বলে বিজ্ঞাপন দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই। প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের বেশের মধ্যে এমন কিছু ভঙ্গী থাকে, যাতে বোঝা যায় তারা বিশেষভাবে পুরুষের মোহদৃষ্টির প্রতি দাবী রেখেছে। এখানকার মেয়েদের কাপড় সুন্দর, কিন্তু সে কাপড়ে দেহের পরিচয়কে ইঙ্গিতের দ্বারা দেখাবার কোনো চেষ্টা নেই। জাপানীদের মধ্যে চরিত্র-দৌর্বল্য যে কোথাও নেই তা আমি বলছি নে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে ঘিরে তুলে

প্রায় সকল সভ্যদেশেই মানুষ যে একটা কৃত্রিম মোহ-পরিবেষ্টন
রচনা করেছে, জাপানীর মধ্যে অস্তুত তার একটা আয়োজন কম
বলে মনে হল, এবং অস্তুত সেই পরিমাণে এখানে স্ত্রী-পুরুষের
সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং মোহমুক্ত।

আর একটি জিনিষ আমাকে বড় আনন্দ দেয়, সে হচ্ছে
জাপানের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। রাস্তায় ঘাটে সর্বত্র এত
বেশী পরিমাণে এত ছোট ছেলেমেয়ে আমি আর কোথাও দেখি
নি। আমার মনে হল, যে কারণে জাপানীরা ফুল ভালবাসে,
সেই কারণেই ওরা শিশু ভালবাসে। শিশুর ভালবাসায় কোন
কৃত্রিম মোহ নেই—আমরা ওদের ফুলের মতই নিঃস্বার্থ নিরাসক্ত-
ভাবে ভালবাসতে পারি।

কাল সকালেই ভারতবর্ষের ডাক যাবে, এবং আমরাও
টোকিয়ো যাত্রা করব। একটি কথা তোমরা মনে রেখো—আমি
যেমন যেমন দেখছি, তেমনি তেমনি লিখে চলেছি। এ কেবল
একটা নতুন দেশের উপর চোখ বুলিয়ে যাবার ইতিহাস মাত্র।
এর মধ্যে থেকে তোমরা কেউ যদি অধিক পরিমাণে, এমন কি,
অল্প পরিমাণেও “বস্তুতন্ত্রতা” দাবী কর ত নিরাশ হবে। আমার
এই চিঠিগুলি জাপানের ভূবৃত্তান্তরূপে পাঠ্য-সমিতি নির্বাচন
করবেন না, নিশ্চয় জানি। জাপান সম্বন্ধে আমি যা কিছু
মতামত প্রকাশ করে চলেছি, তার মধ্যে জাপান কিছু পরিমাণে
আছে, আমিও কিছু পরিমাণে আছি, এইটে তোমরা যদি মনে
নিয়ে পড়—তাহলেই ঠকবে না। ভুল বলব না, এমন আমার

প্রতিজ্ঞা নয়;—যা মনে হচ্ছে তাই বলুন, এই আমার
মতলব।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

কোবে।

১৪

যেমন-বেমন দেখি তেমনি-তেমনি লিখে যাওয়া আর সম্ভব
নয়। পূর্বেই লিখেছি, জাপানীরা বেশী ছবি দেয়ালে টাঙায়
না, গৃহসজ্জায় ঘর ভরে কেলে না। যা তাদের কাছে রমণীয়,
তা তারা অল্প করে দেখে; দেখা সম্বন্ধে এরা যথার্থ ভোগী
বলেই, দেখা সম্বন্ধে এদের পেটুকতা নাই। এরা জানে, অল্প
করে না দেখলে পূর্ণ পরিমাণে দেখা হয় না। জাপান-দেখা
সম্বন্ধেও আমার তাই ঘটছে;—দেখবার জিনিষ একেবারে হুড়-
মুড় করে চারদিক থেকে চোখের উপর চেপে পড়ছে;—তাই
প্রত্যেকটিকে স্পর্শ করে সম্পূর্ণ করে দেখা এখন আর সম্ভব
হয় না। এখন কিছু রেখে কিছু বাদ দিয়ে চলতে হবে।

এখানে এসেই আদর অভ্যর্থনার সাইক্লোনের মধ্যে পড়ে
গেছি; সেই সঙ্গে খবরের কাগজের চরেরা চারিদিকে তুফান
লাগিয়ে দিয়েছে। এদের কাঁক দিয়ে যে জাপানের আর কিছু
দেখব, এমন আশা ছিল না। জাহাজে এরা হেঁকে ধরে,
রাস্তায় এরা সঙ্গে সঙ্গে চলে, ঘরের মধ্যে এরা ঢুকে পড়তে
সঙ্কোচ করে না।

এই কোতূহলীর ভিড় ঠেলেতে ঠেলেতে, অবশেষে টোকিয়ো সহরে এসে পৌঁছন গেল। এখানে আমাদের চিত্রকর বন্ধু যোকোয়ামা টাইকানের বাড়িতে এসে আশ্রয় পেলুম। এখন থেকে ক্রমে জাপানের অন্তরের পরিচয় পেতে আরম্ভ করা গেল।

প্রথমেই জুতো জোড়াটাকে বাড়ির দরজার কাছে ত্যাগ করতে হল। বুকলুম জুতো জোড়াটা রাস্তার, পা জিনিষটাই ঘরের। ধুলো জিনিষটাও দেখলুম এদের ঘরের নয়, সেটা বাইরের পৃথিবীর। বাড়ির ভিতরকার সমস্ত ঘর এবং পথ মাদুর দিয়ে মোড়া, সেই মাদুরের নীচে শক্ত খড়ের গদি; তাই এদের ঘরের মধ্যে যেমন পায়ের ধুলো পড়ে না, তেমনি পায়ের শব্দও হয় না। দরজাগুলো ঠেলা দরজা, বাতাসে যে ধড়াধড় পড়বে এমন সম্ভাবনা নেই।

আর একটা ব্যাপার এই,—এদের বাড়ি জিনিষটা অত্যন্ত অধিক নয়। দেয়াল, কড়ি, বরগা, জানালা, দরজা, যতদূর পরিমিত হতে পারে, তাই। অর্থাৎ বাড়িটা মানুষকে ছাড়িয়ে যায় নি, সম্পূর্ণ তার আয়ত্তের মধ্যে। একে মাজা ঘষা ধোওয়া মোছা দুঃসাধ্য নয়।

তারপরে, ঘরে যেটুকু দরকার, তা ছাড়া আর কিছু নেই। ঘরের দেয়াল মেঝে সমস্ত যেমন পরিষ্কার, তেমনি ঘরের কাঁক-টুকুও বেন তক্তক করচে, তার মধ্যে বাজে জিনিষের চিহ্নমাত্র পড়ে নি। মস্ত স্ফিধে এই যে, এদের মধ্যে ঘাদের সাবেক

চাল আছে, তারা চৌকি টেবিল একেবারে ব্যবহার করে না। সকলেই জানে চৌকি টেবিলগুলো জীব নয় যটে, কিন্তু তারা হাত-পা-ওয়ালা। যখন তাদের কোনো দরকার নেই, তখনো তারা দরকারের অপেক্ষায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অতিথিরা আসতে যাচ্ছে, কিন্তু অতিথিদের এই খাপগুলি জায়গা জুড়েই আছে। এখানে ঘরের মেজের উপরে মানুষ বসে, সুতরাং যখন তারা চলে যায়, তখন ঘরের আকাশে তারা কোনো বাধা রেখে যায় না। ঘরের একধারে মাদুর নেই, সেখানে পালিশ করা কাঠখণ্ড কক্কক্ করছে, সেই দিকের দেয়ালে একটি ছবি ঝুলছে, এবং সেই ছবির সামনে সেই তক্তাটির উপর একটি ফুলদানীর উপরে ফুল সাজানো। ঐ যে ছবিটি আছে, এটা আড়ম্বরের জন্মে নয়, এটা দেখবার জন্মে। সেইজন্মে যাতে ওর গা ঘেঁসে কেউ না বসতে পারে, যাতে ওর সামনে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত অবকাশ থাকে, তারি ব্যবস্থা রয়েছে। সুন্দর জিনিষকে যে এরা কত শ্রদ্ধা করে, এর থেকেই তা বোঝা যায়। ফুল সাজানোও তেমনি। অন্তত নানা ফুল ও পাতাকে ঠেসে একটা তোড়ার মধ্যে বেঁধে ফেলে—ঠিক মেগন করে বারুণীযোগের সময় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এক গাড়িতে ভর্তি করে দেওয়া হয়, তেমনি,—কিন্তু এখানে ফুলের প্রতি সে অত্যাচার হবার জো নেই—ওদের জন্মে খার্ডক্লাসের গাড়ি নয়, ওদের জন্মে রিজার্ভ-করা সেলুন। ফুলের সঙ্গে ব্যবহারে এদের না আছে দড়াদড়ি, না আছে ঠেলাঠেলি, না আছে হট্টগোল।

ভোরের বেলা উঠে জানালার কাছে আলন পেতে যখন বসলুম, তখন বুঝলুম জাপানীরা কেবল যে শিল্পকলায় ওস্তাদ, তা নয়,—মানুষের জীবনযাত্রাকে এরা একটি কলাবিদ্যার মত আয়ত্ত করেছে। এরা এটুকু জানে, যে-জিনিসের মূল্য আছে গৌরব আছে, তার জন্মে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেওয়া চাই। পূর্ণতার জন্মে রিক্ততা সব চেয়ে দরকারী। বস্তুবাহুল্য জীবন-বিকাশের প্রধান বাধা। এই সমস্ত বাড়িটির মধ্যে কোথাও একটি কোণেও একটু অনাদর নেই, অনাবশ্যকতা নেই। চোথকে মিছিমিছি কোন জিনিস আঘাত করছে না, কানকে বাজে কোন শব্দ বিরক্ত করছে না,—মানুষের মন নিজেকে যতখানি ছড়াতে চায় ততখানি ছড়াতে পারে, পদে পদে জিনিসপত্রের উপরে ঠোকর খেয়ে পড়ে না।

যেখানে চারিদিকে এলোমেলো, ছড়াছড়ি নানা জঞ্জাল, নানা আওয়াজ,—সেখানে যে প্রতিমূহূর্তেই আমাদের জীবনের এবং মনের শক্তিক্ষয় হচ্ছে, সে আমরা অভ্যাসবশত বুঝতে পারি নে। আমাদের চারিদিকে যা কিছু আছে, সমস্তই আমাদের প্রাণ-মনের কাছে কিছু-না-কিছু আদায় করছেই। যে সব জিনিস অদরকারী এবং অশুন্দর, তারা আমাদের কিছুই দেয় না—কেবল আমাদের কাছ থেকে নিতে থাকে। এমনি করে নিশিদিন আমাদের যা ক্ষয় হচ্ছে, সেটাতে আমাদের শক্তির কম অপব্যয় হচ্ছে না।

সেদিন সকালবেলায় মনে হল আমার মন যেন কানায়

কানায় ভরে উঠেছে। এতদিন বেরকম করে মনের শক্তি বহন করেছি, সে যেন চালুনিতে জল ধরা, কেবল গোলমালের ছিদ্র দিয়ে সমস্ত নেরিয়ে গেছে; আর এখানে এ যেন ঘটের ব্যবস্থা। আমাদের দেশের ক্রিয়াকর্মের কথা মনে হল। কি প্রচুর অপব্যয়! কেবলমাত্র জিনিষপত্রের গণ্ডগোল নয়,—মানুষের কি চেষ্টামেচি, ছুটোছুটি, গলা-ভাড়াভাড়া! আমাদের নিজের বাড়ির কথা মনে হল। বাঁকাচোরা উঁচুনিচু রাস্তার উপর দিয়ে গোরুর গাড়ি চলার মত সেখানকার জীবনযাত্রা। যতটা চলচে তার চেয়ে আওয়াজ হচ্ছে ঢের বেশী। দরওয়ান হাঁক দিচ্ছে, বেহারাদের ছেলেরা চেষ্টামেচি করছে, মেথরদের মহলে ঘোরতর ঝগড়া বেধে গেছে, মাড়োয়াড়ি প্রতিবেশিনীরা টাঁৎকার শব্দে একঘেয়ে গান ধরেছে, তার আর অমুই নেই। আর ঘরের ভিতরে নানা জিনিসপত্রের ব্যবস্থা এবং অব্যবস্থা,—তার বোঝা কি কম! সেই বোঝা কি কেবল ঘরের মেঝে বহন করছে! তা নয়,—প্রতিক্ষণেই আমাদের মন বহন করছে। যা গোছালো, তার বোঝা কম; যা অগোছালো, তার বোঝা আরো বেশী,—এই যা তফাত। যেখানে একটা দেশের সমস্ত লোকই কম চেষ্টায়, কম জিনিষ ব্যবহার করে, ব্যবস্থাপূর্বক কাজ করতে যাদের আশ্চর্য্য দক্ষতা,—সমস্ত দেশ জুড়ে তাদের যে কতখানি শক্তি জমে উঠেছে, তার কি হিসেব আছে?

জাপানীরা যে রাগ করেনা, তা নয়,—কিন্তু সকলের কাছেই একবাক্যে শুনেছি, এরা ঝগড়া করে না। এদের গালাগালির

ভিধানে একটিমাত্র কথা আছে—বোকা—তার উর্কে এদের গাষা পৌঁছায় না! ঘোরতর রাগা রাগি মনাস্তর হয়ে গেল, পাশের ঘরে তার টুঁশক পৌঁছল না,—এইটি হচ্ছে জাপানী ঠিতি। শোকদুঃখ সম্বন্ধেও এই রকম স্ত্রুক্রতা।

এদের জীবনযাত্রায় এই রিক্ততা, বিরলতা, মিতাচার কেবল- ঠাত্র যদি অভাবাত্মক হত, তাহলে সেটাকে প্রশংসা করবার কানো হেতু থাকত না। কিন্তু এইত দেখচি, এরা ঝগড়া করে না বটে, অথচ প্রয়োজনের সময় প্রাণ দিতে প্রাণ নিতে এরা পিছপাও হয় না। জিনিসপত্রের ব্যবহারে এদের সংযম, কিন্তু জিনিসপত্রের প্রতি প্রভুত্ব এদের ত কম নয়। সকল বিষয়েই এদের যেমন শক্তি, তেমনি নৈপুণ্য, তেমনি সৌন্দর্য্য- বাধ।

এ সম্বন্ধে যখন আমি এদের প্রশংসা করেচি, তখন এদের মনেকের কাছেই শুনেছি যে, “এটা আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে পেরেচি। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের একদিকে সংযম আর একদিকে মৈত্রী, এই যে সামঞ্জস্যের সাধনা আছে, এতেই আমরা মিতা- চারের দ্বারাই অমিত শক্তির অধিকার পাই। বৌদ্ধধর্ম যে মধ্যপথের ধর্ম।”

শুনে আমার লজ্জা বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম ত আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রাকে ত এমন আশ্চর্য্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুলতে পারে নি। আমাদের কল্পনার

ও কাজে এমনতর প্রভূত আতিশয্য, ঔদাসীন্য, উচ্ছ্বলতা, কোথা থেকে এল ?

একদিন জাপানী নাচ দেখে এলুম। মনে হল এ যেন দেহ-ভঙ্গীর সঙ্গীত। এই সঙ্গীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ পদে পদে মীড়। ভঙ্গীবৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই, কিন্তু কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না ;—সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মত একসঙ্গে দুলভে দুলভে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি যুরোপীয় নাচ অর্ধনারীশ্বরের মত, আধখানা ব্যায়াম আধখানা নাচ ; তার মধ্যে লক্ষ্যবান্ধ, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি-ছোঁড়াছুঁড়ি আছে। জাপানী নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্য-লীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গীর মধ্যে লালসার ইসারামাত্র দেখা গেল না। আমার কাছে তার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা জাপানীর মনে এমন সত্য যে, তার মধ্যে কোনোরকমের মিশাল তাদের দরকার হয় না, এবং সহ্য হয় না।

কিন্তু এদের সঙ্গীতটা আমার মনে হল বড় বেশীদূর এগোয় নি। বোধ হয় চোক আর কান, এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না। মনের শক্তিশ্রোত যদি এর কোনো একটা রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত বেশী আনাগোনা করে, তাহলে অন্য রাস্তাটার তার ধারা অগভীর হয়। ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিসটা

গগনের। অসীম বেখানে সীমার মধ্যে, সেখানে ছবি; অসীম বেখানে সীমাহীনতায়, সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর একটা দিকে সুর; এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

জাপানী রূপরাজ্যের সমস্ত দখল করেছে। যা কিছু চোখে পড়ে, তার কোথাও জাপানীর আলস্য নেই, অনাদর নেই; তার সর্বত্রই সে একেবারে পরিপূর্ণতার সাধনা করেছে। অন্য দেশে গুণী এবং রসিকের মধ্যেই রূপ-রসের যে বোধ দেখতে পাওয়া যায়, এ দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েছে। যুরোপে সর্বজনীন বিদ্যাশিক্ষা আছে, সর্বজনীন সৈনিকতার চর্চাও সেখানে অনেক জায়গায় প্রচলিত,—কিন্তু এমনতর সর্বজনীন রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তাতে কি এরা বিলাসী হয়েছে? অকর্মণ্য হয়েছে? জীবনের কঠিন সমস্যা ভেদ করতে এরা কি উদাসীন কিম্বা অকর্ম হয়েছে?—ঠিক তার উল্টো। এরা এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই মিতাচার শিখেছে; এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই এরা বীর্য এবং কর্মনৈপুণ্য লাভ করেছে। আমাদের দেশে একদল লোক আছে, তারা মনে করে শুকতাই বুঝি গৌরব। এবং

কর্তব্যের পথে চলবার সত্বপায় হচ্চু রসের উপবাস,—তারা জগতের আনন্দকে মুড়িয়ে ফেলাকেই জগতের ভাল করা মনে করে ।

যুরোপে যখন গেছি, তখন তাদের কলকারখানা, তাদের কাজের ভিড়, তাদের ঐশ্বর্য্য এবং প্রতাপ খুব করে চোখে পড়েচে এবং মনকে অভিভূত করেছে । তবু “এহ বাছ !” কিন্তু জাপানে আধুনিকতার ছদ্মবেশ ভেদ করে যা চোখে পড়ে, সে হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি । সে অহঙ্কার নয়, আড়ম্বর নয়,—সে পূজা । প্রতাপ নিজেকে প্রচার করে ; এই জন্মে যতদূর পারে বস্তুর আয়তনকে বাড়িয়ে তুলে’ আর-সমস্তকে তার কাছে নত করতে চায় । কিন্তু পূজা আপনার চেয়ে বড়কে প্রচার করে ; এই জন্মে তার আয়োজন সুন্দর এবং খাঁটি, কেবলমাত্র মস্ত এবং অনেক নয় । জাপান আপনার ঘরে বাইরে সর্বত্র সুন্দরের কাছে আপন অর্ঘ্য নিবেদন করে দিচ্ছে । এদেশে আসবামাত্র সকলের চেয়ে বড় বাণী যা কানে এসে পৌঁছয় সে হচ্ছে “আমার ভাল লাগল, আমি ভাল বাসলুম ।” এই কথাটি দেশসুদ্ধ সকলের মনে উদয় হওয়া সহজ নয়, এবং সকলের বাণীতে প্রকাশ হওয়া আরো শক্ত । এখানে কিন্তু প্রকাশ হয়েছে । প্রত্যেক ছোট জিনিষে, ছোট ব্যবহারে, সেই আনন্দের পরিচয় পাই । সেই আনন্দ, ভোগের আনন্দ নয়,—পূজার আনন্দ । সুন্দরের প্রতি এমন আন্তরিক সম্ভ্রম অল্প কোথাও দেখি নি । এমন সাবধানে বস্তু, এমন শুচিতা রক্ষা

করে সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে, অন্য কোনো জাতি শেখে নি। বা এদের ভাল লাগে, তার সামনে এরা শঙ্ক করে না। সংঘর্ষই প্রচুরতার পরিচয়, এবং স্তম্ভতাই গভীরতাকে প্রকাশ করে, এরা সেটা অন্তরের ভিতর থেকে বুঝে। এবং এরা বলে সেই আন্তরিক বোধশক্তি এরা বৌদ্ধধর্মের সাধনা থেকে পেয়েছে। এরা স্থির হয়ে শক্তিকে নিরোধ করতে পেরেছে বলেই, সেই অক্ষুণ্ণ শক্তি এদের দৃষ্টিকে বিশুদ্ধ এবং বোধকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

পূর্বেই বলেছি, প্রতাপের পরিচয়ে মন অভিভূত হয়—কিন্তু এখানে যে পূজার পরিচয় দেখি, তাতে মন অভিভবের অপমান অনুভব করে না। মন আনন্দিত হয়, ঈর্ষান্বিত হয় না। কেননা, পূজা যে আপনার চেয়ে বড়কে প্রকাশ করে, সেই বড়র কাছে সকলেই আনন্দমনে নত হতে পারে, মনে কোথাও বাজে না। দিল্লিতে যেখানে প্রাচীন হিন্দু রাজার কীর্তিকলার বৃকের মাঝখানে কুতুবমিনার অহঙ্কারের মুঘলের মত খাড়া হয়ে আছে, সেখানে সেই ঔদ্ধত্য মানুষের মনকে পীড়া দেয়, কিম্বা কাশীতে যেখানে হিন্দুর পূজাকে অপমানিত করবার জন্তে আরঙজীব মসজিদ স্থাপন করেছে, সেখানে না দেখি শ্রীকে, না দেখি কল্যাণকে। কিন্তু যখন তাজমহলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন এ তর্ক মনে আসে না যে, এটা হিন্দুর কীর্তি, না মুসলমানের কীর্তি। তখন এ'কে মানুষের কীর্তি বলেই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি।

জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, সেটা অহঙ্কারের প্রকাশ নয়,—আত্মনিবেদনের প্রকাশ ; সেই জন্মে এই প্রকাশ মানুষকে আহ্বান করে, আঘাত করে না। এই জন্মে জাপানে যেখানে এই ভাবের বিরোধ দেখি, সেখানে মনের মধ্যে বিশেষ পীড়া বোধ করি। চীনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল—সেই জয়ের চিহ্নগুলিকে কাঁটার মত দেশের চারদিকে পুঁতে রাখা যে বর্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সে কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল। প্রয়োজনের খাতিরে অনেক ক্রুর কर्म মানুষকে করতে হয়, কিন্তু সেগুলোকে ভুলতে পারাই মনুষ্যত্ব। মানুষের যা চিরস্মরণীয়, যার জন্মে মানুষ মন্দির করে, মঠ করে,—সেই হিংসা নয়।

আমরা অনেক আচার, অনেক আসবাব যুরোপের কাছ থেকে নিয়েছি—সব সময়ে প্রয়োজনের খাতিরে নয়—কেবলমাত্র সেগুলো যুরোপীয় বলেই। যুরোপের কাছে আমাদের মনের এই যে পরাভব ঘটেছে, অভ্যাসবশত সেজন্মে আমরা লজ্জা করতেও ভুলে গেছি। যুরোপের যত বিজ্ঞা আছে, সবই আমাদের শেখবার—এ কথা মানি ; কিন্তু যত ব্যবহার আছে, সবই যে আমাদের নেবার—এ কথা আমি মানি নে। তবু, যা নেবার যোগ্য জিনিস, তা সব দেশ থেকেই নিতে হবে—এ কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই জন্মেই, জাপানে যে সব ভারতবাসী এসেছে, তাদের সম্বন্ধে একটা কথা আমি বুঝতে পারি নে। দেখতে পাই তারা ত যুরোপের নানা

অनावশ্যক, নানা কুশ্রী জিনিষও নকল করেছে; কিন্তু তারা কি জাপানের কোনো জিনিষই চোখে দেখতে পায় না? তারা এখান থেকে যে সব বিছা শেখে, সেও যুরোপের বিছা—এবং যাদের কিছুমাত্র আর্থিক বা অন্তরকম সুবিধা আছে, তারা কোনমতে এখান থেকে আমেরিকায় দৌড় দিতে চায়। কিন্তু যে সব বিছা এবং আচার ও আসবাব জাপানের সম্পূর্ণ নিজের, তার মধ্যে কি আমরা গ্রহণ করবার জিনিষ কিছুই দেখি নে?

আমি নিজের কথা বলতে পারি, আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী জিনিষ আমরা এখান থেকে যত নিতে পারি, এমন যুরোপ থেকে নয়। তা ছাড়া জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসকোচে জাপানের কাছ থেকে শিখে নিতে পারতুম, তাহলে আমাদের ঘর দুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত। জাপান ভারতবর্ষ থেকে যা পেয়েছে, তাতে আজ ভারতবর্ষকে লজ্জা দিচ্ছে; কিন্তু দুঃখ এই যে, সেই লজ্জা অনুভব করবার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের যত লজ্জা সমস্ত কেবল যুরোপের কাছে,—তাই যুরোপের ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে কুড়িয়ে তালি-দেওয়া অসুত আবরণে আমরা লজ্জা রক্ষা করতে চাই। এদিকে জাপান-প্রবাসী ভারতবাসীরা বলে, জাপান আমাদের এসিয়াবাসী বলে অবজ্ঞা করে; অথচ আমরাও জাপানকে এমনি অবজ্ঞা করি যে, তার আতিথ্য গ্রহণ করেও প্রকৃত জাপানকে চক্ষেও দেখি নে, জাপানের ভিতর দিয়ে

বিকৃত যুরোপকেই কেবল দেখি। জাপানের যদি দেখতে পেতুম, তাহলে আমাদের ঘর থেকে অনেক কুসংস্কার, অশুচিতা অব্যবস্থা, অসংযম আজ দূরে চলে যেত।

বাঙলা দেশে আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েছে। আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করি। নকল করবার জন্মে নয়, শিক্ষা করবার জন্মে। শিল্প জিনিষটা যে কত বড় জিনিষ, সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড় সম্পদ, কেবলমাত্র সৌখিনতাকে সে যে কতদূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে—তার মধ্যে জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, রসিকের রসবোধ যে কত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে, তা এখানে এলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়।

টোকিওতে আমি যে শিল্পীবন্ধুর বাড়ীতে ছিলাম, সেই টাইকানের নাম পূর্বেই বলেছি, ছেলেমানুষের মত তাঁর সরলতা; তাঁর হাসি, তাঁর চারিদিককে হাসিয়ে রেখে দিয়েছে। প্রসন্ন তাঁর মুখ, উদার তাঁর হৃদয়, মধুর তাঁর স্বভাব। যত দিন তাঁর বাড়ীতে ছিলাম, আমি জানতেই পারি নি তিনি কত বড় শিল্পী। ইতিমধ্যে যোকোহামায় একজন ধনী এবং রসজ্ঞ ব্যক্তির আমরা আতিথ্য লাভ করেছি। তাঁর এই বাগানটি নন্দনবনের মত এবং তিনিও সকল বিষয়ে এখানকারই যোগ্য। তাঁর নাম “হারা”। তাঁর কাছে শুনলুম, যোকোয়ামা টাইকান এবং তানজান শিমোমুরা আধুনিক জাপানের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁরা আধুনিক যুরোপের নকল করেন না, প্রাচীন জাপানেরও

না। তাঁরা প্রথার বন্ধন থেকে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়ে-
 চেন। হারার বাড়িতে টাইকানের ছবি যখন প্রথম দেখলুম,
 আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। তাতে না আছে বাহুল্য, না আছে
 সৌধিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে, তেমনি সংযম।
 বিষয়টা এই; চীনের একজন প্রাচীন কালের কবি ভাবে ভোর
 হয়ে চলেচে—তার পিছনে একজন বালক একটি বীণাবন্ধ বহু
 যত্নে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তার নেই; তার পিছনে
 একটি বাঁকা উইলো গাছ। জাপানে তিনভাগওয়ালো যে খাজা
 পর্দার প্রচলন আছে, সেই রেশমের পর্দার উপর অঁকা।
 মস্ত পর্দা এবং প্রকাণ্ড ছবি। প্রত্যেক রেখা প্রাণে ভরা।
 এর মধ্যে ছোটখাটো কিম্বা জবড়জঙ্গ কিছুই নেই—যেমন উদার,
 তেমনি গভীর, তেমনি আয়াসহীন। নৈপুণ্যের কথা একেবারে
 মনেই হয় না—নানা রং, নানা রেখার সমাবেশ নেই—দেখবামাত্র
 মনে হয় খুব বড় এবং খুব সত্য। তারপরে তাঁর ভূদৃশ্যচিত্র
 দেখলুম। একটি ছবি,—পটের উচ্চপ্রান্তে একখানি পূর্ণচাঁদ,
 মাঝখানে একটি নৌকা, নীচের প্রান্তে দুটো দেওদার গাছের
 ডাল দেখা যাচ্ছে—আর কিছু না—জলের কোনো রেখা পর্যন্ত
 নেই। জ্যোৎস্নার আলোর স্থির জল কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ শুভ্রতা,
 —এটা যে জল, সে কেবলমাত্র ঐ নৌকা আছে বলেই বোঝা
 যাচ্ছে, ; আর এই সর্বব্যাপী বিপুল জ্যোৎস্নাকে ফলিয়ে তোলা-
 বার জগ্গে যত কিছু কালিমা,—সে কেবলি ঐ দুটো পাইন গাছের
 ডালে। ওস্তাদ এমন একটা জিনিসকে অঁকতে চেয়েচেন, যার

রূপ নেই, যা বৃহৎ এবং নিস্তরু—জ্যোৎস্নারাজি,—অতলস্পর্শ-
 তার নিঃশব্দতা। কিন্তু আমি যদি তাঁর সব ছবির বিস্তারিত বর্ণনা
 করতে যাই, তাহলে আমার কাগজও ফুরোবে, সময়েও কুলবে
 না। হারা সান সবশেষে নিয়ে গেলেন একটি লম্বা সর্দীর্ণ
 ঘরে, সেখানে একদিকের প্রায় সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটি শাড়া
 পর্দা দাঁড়িয়ে। এই পর্দায় শিমোমুরার আঁকা একটি প্রকাণ্ড
 ছবি। শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে—প্লাম গাছের ডালে
 একটাও পাতা নেই, শাদা শাদা ফুল ধরেছে—ফুলের পাপড়ি
 ঝরে ঝরে পড়ছে ;—বৃহৎ পর্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে
 রক্তবর্ণ সূর্য্য দেখা দিয়েছে—পর্দার অপর প্রান্তে প্লাম গাছের
 রিক্ত ডালের আড়ালে দেখা যাচ্ছে একটা অন্ধ হাতজোড় করে
 সূর্য্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য্য,
 আর সোনায় ঢালা এক সুরবৃহৎ আকাশ ; এমন ছবি আমি
 কখনো দেখি নি। উপনিষদের সেই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধরে
 আমার কাছে দেখা দিলে,—তমসো মা জ্যোতির্গময়। কেবল
 অন্ধ মানুষের নয়, অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা—তমসো মা
 জ্যোতির্গময়—সেই প্লাম গাছের একাগ্র প্রসারিত শাখা প্রশা-
 খার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠছে। অথচ আলোর
 আলোময়—তারি মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।

কাল শিমোমুরার আর একটা ছবি দেখলুম। পটের
 আয়তন শু ছোট, অথচ ছবির বিষয় বিচিত্র। সাধক তার ঘরের
 মধ্যে বসে ধ্যান করছে—তার সমস্ত রিপুগুলি তাকে চারদিকে

আক্রমণ করেছে। অর্ধেক মানুষ অর্ধেক জন্তুর মত তাদের আকার, অত্যন্ত কুৎসিত—তাদের কেউ বা খুব সমারোহ করে আসচে, কেউ বা আড়ালে আবড়ালে উকিঝুঁকি মারচে। কিন্তু তবু এরা সবাই বাইরেই আছে—ঘরের ভিতরে তার সামনে সকলের চেয়ে তার বড় রিপু বসে আছে—তার মূর্তি ঠিক বুদ্ধের মত। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলেই সেখা যায়; সে সাঁচা বুদ্ধ নয়,—শূল তার দেহ, মুখে তার বাঁকা হাসি। সে কপট আত্মস্তুপিতা, পবিত্র রূপ ধরে এই সাধককে বঞ্চিত করচে। এ হচ্ছে আধ্যাত্মিক অহমিকা, শুচি এবং সুগম্ভীর মুক্তস্বরূপ বুদ্ধের ছদ্মবেশ ধরে আছে—একেই চেনা শক্ত—এই হচ্ছে অন্তরতম রিপু, অন্য কদর্যা রিপুরা বাইরের। এইখানে দেবতাকে উপলক্ষ্য করে মানুষ আপনার প্রবৃত্তিকে পূজা করচে।

আমরা বঁার আশ্রয়ে আছি, সেই হারা সান গুণী এবং গুণজ্ঞ। তিনি রসে হান্তে ঔদার্য্যে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের গায়ে তাঁর এই পরম সুন্দর বাগানটি সর্বসাধারণের জন্মে নিত্যই উদ্ঘাটিত। মাঝে মাঝে বিশ্রামগৃহ আছে,—যে খুসি সেখানে এসে চা খেতে পারে। একটা খুব লম্বা ঘর আছে, সেখানে যারা বনভোজন করতে চায় তাদের জন্মে ব্যবস্থা আছে। হারা সানের মধ্যে কৃপণতাও নেই, আড়ম্বরও নেই, অথচ তাঁর চারদিকে সমারোহ আছে। মুঢ় ধনাভিমাত্রীর মত তিনি মূল্য-বান জিনিষকে কেবলমাত্র সংগ্রহ করে রাখেন না,—তার মূল্য

তিনি বুঝেন, তার মূল্য তিনি দেন, এবং তার কাছে তিনি সম্মুখে
আপনাকে নত করতে জানেন।

১৫

এসিয়ার মধ্যে জাপানই এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব
করলে যে, যুরোপ যে-শক্তিতে পৃথিবীতে সর্ববজয়ী হয়ে উঠেছে
একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো যায়। নইলে
তার চাকার নীচে পড়তেই হবে এবং একবার পড়লে কোন-
কালে আর ওঠবার উপায় থাকবে না।

এই কথাটি যেমনি তার মাথায় ঢুকল, অমনি সে আর এক
মুহূর্ত দেরি করলে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই যুরোপের
শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে। যুরোপের কামান বন্দুক,,
কুচ-কাওয়াক, কল কারখানা, আপিস আদালত, আইন কানুন
যেন কোন্ আলাদিনের প্রদীপের যাদুতে পশ্চিমলোক থেকে
পূর্বলোকে একেবারে আস্ত উপড়ে এনে বসিয়ে দিলে। নতুন
শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সহিয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়; তাকে
ছেলের মত শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ করে তোলা নয়;—
তাকে জামাইয়ের মত একেবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ
করে নেওয়া। বৃদ্ধ বনস্পতিকে এক জায়গা থেকে তুলে আর
এক জায়গায় রোপণ করবার বিদ্যা জাপানের মালীয়া জানে—
যুরোপের শিক্ষাকেও তারা তেমনি করেই তার সমস্ত জটিল

শিকড় এবং বিপুল ডালপালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে এক রাত্রির মধ্যেই খাড়া করে দিলে। শুধু যে তার পাতা করে' পড়ল না তা নয়,—পরদিন থেকেই তার ফল ধরতে লাগল। প্রথম কিছু দিন ওরা যুরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া করে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে—কেবল পালটা এমন আড় করে ধরেচে যাতে পশ্চিমের হাওয়াটা তার উপরে পুরো এসে লাগে।

ইতিহাসে এত বড় আশ্চর্য ঘটনা আর কখনো হয় নি। কারণ, ইতিহাস ত যাত্রার পালা গান করা নয় যে, ষোলো বছরের ছোকরাকে পাকা গোঁপদাড়ি পরিয়ে দিলেই সেই মুহূর্তে তাকে নারদমুনি করে তোলা যেতে পারে! শুধু যুরোপের অস্ত্র ধার করলেই যদি যুরোপ হওয়া যেত, তাহলে আফগানিস্থানেরও ভাবনা ছিল না। কিন্তু যুরোপের আসবাবগুলো ঠিকমত ব্যবহার করবার মত মনোরুত্তি জাপান এক নিমেষেই কেমন করে গড়ে তুলে, সেইটেই বোঝা শক্ত।

সুতরাং এ কথা মানতেই হবে, এ জিনিষ তাকে গোড়া থেকে গড়তে হয় নি,—ওটা তার একরকম গড়াই ছিল। সেই জন্তেই যেমনি তার চৈতন্য হল, অমনি তার প্রস্তুত হতে বিলম্ব হল না। তার যা-কিছু বাধা ছিল, সেটা বাইরের—অর্থাৎ একটা নতুন জিনিসকে বুঝে পড়ে আয়ত্ত করে নিতে যেটুকু বাধা, সেইটুকু মাত্র ;—তার নিজের অন্তরে কোনো বিরোধের বাধা ছিল না।

পৃথিবীতে মোটামুটি দু'রকম জাতের মন আছে—এক স্বাবর, আর এক জঙ্গম। এই মানসিক স্বাবর-জঙ্গমতার মধ্যে একটা ঐকান্তিক ভেদ আছে, এমন কথা বলতে চাই নে। স্বাবরকেও দায়ে পড়ে চলতে হয়, জঙ্গমকেও দায়ে পড়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু স্বাবরের লয় বিলম্বিত, আর জঙ্গমের লয় দ্রুত।

জাপানের মনটাই ছিল স্বভাবত জঙ্গম—লম্বা লম্বা দশকুশি তালের গাস্তারি চাল তার নয়। এই জন্মে সে এক দৌড়ে দু'তিন শো বছর ছু ছু করে পেরিয়ে গেল। আমাদের মত যারা দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে হাজার বছর পথের ধারে বটতলায় শুয়ে গড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে, তারা অভিমান করে বলে, “ওরা ভারি হালুকা, আমাদের মত গাস্তারী থাকলে ওরা এমন বিশ্রীকম দৌড়াপ করতে পারত না। সাঁচা জিনিস কখনও এত শীঘ্র গড়ে উঠতে পারে না।”

আমরা যাই বলি না কেন, চোখের সামনে স্পর্শ দেখতে পাচ্ছি এশিয়ার এই প্রান্তবাসী জাত যুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে এবং নৈশুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারচে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থাটাকেই নিয়েচে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পেয়েচে। নইলে পদে পদে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠুকি বেধে যেত, নইলে ওদের শিকার সঙ্গে দীক্ষার লড়াই কিছুতেই মিটত না, এবং বস্তু ওদের দেহটাকে পিষে দিত।

মনের যে জঙ্গমতার জোরে ওরা আধুনিক কালের প্রবল

প্রবাহের সঙ্গে নিজের গতিকে এত সহজে মিলিয়ে দিতে পেরেচে, সেটা জাপানী পেয়েচে কোথা থেকে ?

জাপানীদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, ওরা মিশ্র জাতি। ওরা একেবারে খাস মঙ্গোলীয় নয়। এমন কি, ওদের বিশ্বাস ওদের সঙ্গে আর্য্যবস্তুরও মিশ্রন ঘটেচে। জাপানীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় এবং ভারতীয় দুই ছাঁদেরই মুখ দেখতে পাই, এবং ওদের মধ্যে বর্ণেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। আমার চিত্রকর বন্ধু টাইকানকে বাঙালী কাপড় পরিয়ে দিলে, তাঁকে কেউ জাপানী বলে সন্দেহ করবে না। এমন আরো অনেককে দেখেছি।

যে জাতির মধ্যে বর্ণসঙ্করতা খুব বেশী ঘটেচে তার মনটা এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায় না। প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের সংঘাতে তার মনটা চলনশীল হয়ে থাকে। এই চলনশীলতায় মানুষকে অগ্রসর করে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

বস্তুর অবিমিশ্রতা কোথাও যদি দেখতে চাই, তাহলে বর্ষের জাতির মধ্যে যেতে হয়। তারা পরকে ভয় করেছে, তারা অল্পপরিসর আশ্রয়ের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের জাতকে স্বতন্ত্র রেখেচে। তাই আদিম অষ্ট্রেলীয় জাতির আদিমতা আর ঘুচল না—আফ্রিকার মধ্যদেশে কালের গতি বন্ধ বল্লই হয়।

কিন্তু গ্রীস পৃথিবীর এমন একটা জায়গায় ছিল, যেখানে একদিকে এশিয়া, একদিকে ইজিপ্ট, একদিকে যুরোপের মহাদেশ তার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে তাকে আলোড়িত করেছে।

গ্রীকেরা অবিমিশ্র জাতি ছিল না—রোমকেরাও না। ভারত-বর্ষেও অনার্য্যে আর্য্যে যে মিশ্রণ ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

জাপানীকেও দেখলে মনে হয়, তারা এক ধাতুতে গড়া নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই মিথ্যা করেও আপনার রক্তের অবিমিশ্রতা নিয়ে গর্ব করে—জাপানীর মনে এই অভিমান কিছুমাত্র নেই। জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রণ হয়েছে, এ কথা আলাচনা তাদের কাগজে দেখেছি এবং তা নিয়ে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। শুধু তাই নয়, চিত্র-কলা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কাছে তারা যে ঋণী, সে কথা আমরা একেবারেই ভুলে গেছি—কিন্তু জাপানীরা এই ঋণ স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

বস্তুত ঋণ তারাই গোপন করতে চেষ্টা করে, ঋণ যাদের হাতে ঋণই রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠে নি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে, সেটা সম্পূর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েছে। যে জাতির মনের মধ্যে চলন-ধর্ম্য প্রবল, সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ করে নিতে পারে। যার মন স্বাবর, বাইরের জিনিস তার পক্ষে বিষম ভার হয়ে ওঠে; কারণ, তার নিজের অচল অস্তিত্বই তার পক্ষে প্রকাশ্য একটা বোঝা।

কেবলমাত্র জাতি-সঙ্করতা নয়, স্থান-সঙ্কীর্ণতা জাপানের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে। ছোট জায়গাটি সমস্ত জাতির

মিলনের পক্ষে পুটপাকের কাজ করেছে। বিচিত্র্য উপকরণ ভালরকম করে গলে' মিলে বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছে। চীন বা ভারতবর্ষের মত বিস্তীর্ণ জায়গায়, বৈচিত্র্য কেবল বিভক্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করে, সংহত হতে চায় না।

প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম, এবং আধুনিক কালে ইংলণ্ড সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে বিস্তীর্ণ স্থানকে অধিকার করতে পেরেছে। আজকের দিনে এশিয়ার মধ্যে জাপানের সেই সুবিধা। একদিকে তার মানসপ্রকৃতির মধ্যে চিরকালই চলন-ধর্ম আছে, যে জন্ম চীন কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশীর কাছ থেকে জাপান তার সভ্যতার সমস্ত উপকরণ অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পেরেছে; আর একদিকে অল্প পরিসর জায়গায় সমস্ত জাতি অতি সহজেই এক ভাবে ভাবতে, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হতে পেরেছে। তাই যে-মুহূর্তে জাপানের মস্তিষ্কের মধ্যে এই চিন্তা স্থান পেলো যে, আত্মরক্ষার জন্মে যুরোপের কাছ থেকে তাকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, সেই মুহূর্তে জাপানের সমস্ত কলেবরের মধ্যে অনুকূল চেষ্টা জাগ্রত হয়ে উঠল।

যুরোপের সভ্যতা একান্তভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা, তা স্থাবর মনের সভ্যতা নয়। এই সভ্যতা ক্রমাগতই নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা, নূতন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিপ্লব-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় পক্ষ বিস্তার করে উড়ে চলেছে। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানের মনে সেই স্বাভাবিক চলন-ধর্ম থাকতেই, জাপান সহজেই যুরোপের ক্ষিপ্ততালে চলতে পেরেছে, এবং তাতে করে

তাকে প্রায়ের আঘাত সহ্যে হয় নি। কারণ, উপকরণ সে
 কিছু পাচ্ছে, তার দ্বারা সে সৃষ্টি করতে ; হুতরাং নিজের
 কিছু জীবনের সঙ্গে এ সমস্তকে সে মিলিয়ে মিতে পারচে।
 এই সমস্ত নতুন জিনিস যে তার মধ্যে কোথাও কিছু বাধা পাচ্ছে
 না, তা নয়,—কিন্তু সচলতার বেগেই সেই বাধা কম হয়ে
 চলেচে। প্রথম প্রথম যা অসম্ভব অদ্ভুত হয়ে দেখা দিচ্ছে, ক্রমে
 ক্রমে তার পরিবর্তন ঘটে সুসঙ্গতি জেগে উঠচে। একদিন যে-
 অনাবশ্যককে সে গ্রহণ করেছে, আর একদিন সেটাকে ত্যাগ
 করচে—একদিন যে আপন জিনিসকে পরের হাতে সে খুইয়েচে,
 আর একদিন সেটাকে আবার ফিরে নিচ্ছে। এই তার সংশো-
 ধনের প্রক্রিয়া এখনো নিত্য তার মধ্যে চলচে। যে বিকৃতি
 ঘটায়, তাকেই ঠিক করতে হয়—যে বিকৃতি প্রাণের লীলা-
 বৈচিত্র্যে হঠাৎ এক-এক সময়ে দেখা দেয়, প্রাণ আপনি তাকে
 সামলে নিয়ে নিজের সমে এসে দাঁড়াতে পারে।

আমি যখন জাপানে ছিলাম, তখন একটা কথা বারবার আমার
 মনে এসেচে। আমি অনুভব করছিলাম, ভারতবর্ষের মধ্যে
 বাঙালীর সঙ্গে জাপানীর এক জায়গায় যেন মিল আছে।
 আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালীই সব প্রথমে নূতনকে
 গ্রহণ করেছে, এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার
 মত তার চিন্তের নমনীয়তা আছে।

তার একটা কারণ, বাঙালীর মধ্যে রক্তের অনেক মিশ্রণ
 ঘটেচে ; এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েছে কিনা

সন্দেহ। তারপরে বাঙালী ভারতের যে প্রান্তে বাস করে, সেখানে বহুকাল ভারতের অন্ত্র প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌদ্ধপ্রভাবে, অথবা অন্ত্র যে কারণেই হোক, আচার-ক্রমে হয়ে নিতান্ত এক-ঘরে হয়ে ছিল—তাতে করে তার একটা সঙ্কীর্ণ স্বাভাব্য ঘটেছিল—এই কারণেই বাঙালীর চিন্তা অপেক্ষাকৃত বন্ধনমুক্ত, এবং নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালীর পক্ষে যত সহজ হয়েছিল, এমন ভারতবর্ষের অন্ত্র কোনো দেশের পক্ষে হয় নি। যুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা জাপানের মত আমাদের পক্ষে অবাধ নয়; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই, তার বেশী আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু যুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হত, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালী সকল দিক থেকেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করত। আজ নানাদিক থেকে বিদ্যালয়শিক্ষা আমাদের পক্ষে ক্রমশই দুর্মূল্য হয়ে উঠচে—তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ প্রবেশদ্বারে বাঙালীর ছেলে প্রতিদিন মাথা গোঁড়াখুঁড়ি করে মরচে। বস্তুত ভারতের অন্ত্র সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে যে-একটা অসন্তোষের লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়, তার একমাত্র কারণ আমাদের প্রতিহত গতি। যা-কিছু ইংরেজি, তার দিকে বাঙালীর উদ্বোধিত চিন্তা একান্ত প্রবলবেগে ছুটেছিল; ইংরেজের অত্যন্ত কাছে যাবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েছিলুম—এ সম্বন্ধে সকল রকম সংস্কারের বাধা লঙ্ঘন করবার জন্যে বাঙালীই সর্ব-

প্রথমে উদ্ভূত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এইখানে ইংরেজের কাছেই বধন বাধা পেল, তখন বাঙালীর মনে যে প্রচণ্ড অভিমান জেগে উঠল—সেটা হচ্ছে তার অনুরাগেরই বিকার।

এই অভিমানই আজ নবযুগের শিক্ষাকে গ্রহণ করবার পক্ষে বাঙালীর মনে সকলের চেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে উঠেছে। আজ আমরা যে সকল কূটতর্ক ও মিথ্যা যুক্তি দ্বারা পশ্চিমের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার চেষ্টা করছি, সেটা আমাদের স্বাভাবিক নয়। এই জন্যই সেটা এমন সূতীব্র—সেটা ব্যাধির প্রকোপের মত পীড়ার দ্বারা এমন করে আমাদের সচেতন করে তুলেছে।

বাঙালীর মনের এই প্রবল বিরোধের মধ্যেও তার চলন-ধর্মই প্রকাশ পায়। কিন্তু বিরোধ কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বিরোধে দৃষ্টি কলুষিত ও শক্তি বিকৃত হয়ে যায়। যত বড় বেদনাই আমাদের মনে থাক, এ কথা আমাদের ডুল্লে চলবে না যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের গিংহুয়ার উদ্ঘাটনের তার বাঙালীর উপরেই পড়েছে। এই জন্যই বাংলার নবযুগের প্রথম পথপ্রবর্তক রামমোহন রায়। পশ্চিমকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে তিনি ভীকতা করেন নি, কেননা পূর্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটল ছিল। তিনি যে-পশ্চিমকে দেখতে পোয়েছিলেন, সে ত শত্রুধারী পশ্চিম নয়, বাণিজ্যজীবী পশ্চিম নয়—সে হচ্ছে জ্ঞানে প্রাণে উদ্ভাসিত পশ্চিম।

জাপান যুরোপের কাছ থেকে কস্মের দীক্ষা আর অন্তের

শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে
শিখতে বসেছে। কিন্তু আমি যতটা দেখেছি, তাতে আমার
মনে হয় যুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায়
নৈতিক আছে। যে গুণ ভিত্তির উপরে যুরোপের মহত্ব
প্রতিষ্ঠিত, সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কৰ্ম্মনৈপুণ্য
নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সঙ্গে
যুরোপের মূলগত প্রভেদ। মনুষ্যত্বের যে-সাধনা অমৃত লোককে
দানে, এবং সেই অভিমুখে চলতে থাকে, যে-সাধনা কেবলমাত্র
সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে-সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা
স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম করে আপনার লক্ষ্য স্থাপন
করেছে,—সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে যুরোপের মিল
যত সহজ, জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়। জাপানী
স্বাভ্যতার সৌধ এক-মহলা—সেই হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং
সম্পত্তার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারে সব চেয়ে বড় জিনিষ
স্বাধিকারিত হয়, সে হচ্ছে কৃতকৰ্ম্মতা,—সেখানকার মন্দিরে সব
কিছুরে বড় দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত যুরোপের
মধ্যে সহজেই আধুনিক জৰ্ম্মণির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিক-
শাস্ত্রের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে; নীট্‌বোর গ্রন্থ
স্বাদেশিক কাছ থেকে সব চেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্য্যন্ত জাপান
আল করে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধৰ্ম্মে তার
প্রয়োজন আছে কিনা, এবং ধৰ্ম্মটা কি। কিছু দিন এমনও
তার সঙ্কল্প ছিল যে, সে খৃষ্টানধৰ্ম্ম গ্রহণ করবে। তখন তার

বিশ্বাস ছিল যে, যুরোপ যে-ধর্মকে আশ্রয় করেছে, সেই ধর্ম হয়ত তাকে শক্তি দিয়েছে—অতএব খৃষ্টানীকে কামানবন্দুকে সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ করা দরকার হবে। কিন্তু আধুনিক যুরোপ শক্তি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল থেকে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে যে, খৃষ্টানধর্ম স্বভাবদুর্বলের ধর্ম, তা বীরের ধর্ম নয়। যুরোপ বলতে শুরু করেছিল—যে-মানুষ ক্ষীণ, তারই স্বার্থ নম্রতা ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম প্রচার করা। সংসারে যারা পরাজিত, সে-ধর্মের তাদেরই সুবিধা; সংসারে যারা জয়শীল, সে-ধর্মের তাদের বাধা। এই কথাটা জাপানের মনে সহজেই লেগেছে। এইজন্যে জাপানের রাজশক্তি আজ মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করছে। এই অবজ্ঞা আর কোনো দেশে চলতে পারত না; কিন্তু জাপানে চলতে পারছে, তার কারণ জাপানে এই বোধের বিকাশ ছিল না, এবং সেই বোধের অভাব নিয়েই জাপান আজ গর্ব বোধ করছে—সে জান্চে পরকালের দাবী থেকে সে মুক্ত, এইজন্যই ইহকালে সে জয়ী হবে।

জাপানের কর্তৃপক্ষেরা যে ধর্মকে বিশেষরূপে প্রাশ্রয় দিয়ে থাকেন, সে হচ্ছে শিন্তো ধর্ম। তার কারণ এই ধর্ম কেবলমাত্র সংস্কারমূলক; আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম রাজাকে এবং পূর্ব-পুরুষদের দেবতা বলে মানে। সুতরাং স্বদেশাসক্তিকে সুতীত্র করে তোলবার উপায়রূপে এই সংস্কারকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিন্তু যুরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মত এক-মহাল

। তার একটি অন্তরমহল আছে। সে অনেক দিন থেকেই Kingdom of Heavenকে স্বীকার করে আস্চে। সেখানে য যে, সে জয়ী হয়; পর যে, সে আপনার চেয়ে বেশী হয়ে উঠে। কৃতকর্মতা নয়, পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ। নস্তুর ক্ষেত্রে সংসার সেখানে আপনার সত্য মূল্য লাভ করে।

যুরোপীয় সভ্যতার এই অন্তরমহলের দ্বার কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়, কখনো কখনো সেখানকার দীপ জ্বলে না। তা হোক, কিন্তু এ মহলের পাকা ভিত্তি,—বাইরের কামান গোলা এর দয়াল ভাঙতে পারবে না—শেষ পর্যন্তই এ টিকে থাকবে, এবং এইখানেই সভ্যতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের সঙ্গে যুরোপের আর কোথাও মিল যদি না থাকে, এই বড় জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি—তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশী মানি। যে জন্ম মানুষের দ্বিতীয় জন্ম, তার জন্মে আমরা বেদনা অনুভব করি। এই জায়গায়, মানুষের এই অন্তরমহলে, যুরোপের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের একটা পদচিহ্ন দেখতে পাই। এই অন্তরমহলে মানুষের যে-মিলন, সেই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদ্ঘাটন করবার কাজে বাঙ্গালীর আহ্বান আছে, তার অনেক চিহ্ন অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে।

